রাজসিংহ

প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : তসবিরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই–রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণপ্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনর জন। নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,–কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদলশ্যামা,–খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে–কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদ্মিনী রাণীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজলিস জাঁকাইতেছেন। অধিকাংশই যুবতী; হাসি টিটকারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে–একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে।

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি; প্রাচীনা বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে বাহির করিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার তসবির আয়ি ?"

প্রাচীনা বলিল, "এ শাহজাঁদা বাদশাহের তসবির।"

যুবতী বলিল, "দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।"

আর একজন বলিল, “সে কি লো ? ঠাকুর দাদার নাম দিয়া ঢাকিস্ কেন? ও যে তোর বরের দাড়ি।” পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলল, “ঐ দাড়িতে একদিন একটা বিছা লুকাইয়াছিল– সই আমার ঝাড়ু দিয়া সেই বিছাটা মারিল।”

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর একখানা ছবি দেখাইল। বলিল, “এখানা জাহাঁগীর বাদশাহের ছবি।”

দেখিয়া রসিকা যুবতী বলিল, “ইহার দাম কত?”

প্রাচীনা বড় দাম হাঁকিল।

রসিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, “এ ত গেল ছবির দাম। আসল মানুষটা নুরজাঁহা বেগম কতকে কিনিয়াছিল?”

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল; বলিল, “বিনামূল্যে।”

রসিকা বলিল, “যদি আসলটার এই দশা, তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে দিয়া যাও।”

আবার একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, “হাসিতে মা, তসবির কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তসবির দেখাইব। আর তাঁরই জন্য এ সকল আনিয়াছি।”

তখন সাত জন সাত দিক্ হইতে বলিল, “ওগো, আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী, আমি রাজকুমারী।” বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়া গেল–গোলমাল একটু থামিল–কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল–কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না–তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নির্জ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়–ঐ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুড়ী অবাক্ হইল–এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল–কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “হাঁ গা, তোমরা বল না গা?”

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না–রসের উৎস উছলিয়া উঠিল–হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল–যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো?”

তখন বুড়ী বুঝিল যে, এটা গড়া পুতুল নহে। আদত মানুষ–রাজমহিষী বা রাজকুমারী হইবে। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে–এ প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্রবিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তসবির বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন?"

কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল। যিনি সহচরীকে ঝাড়ুদারি রসিকতাটা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আয়ি বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তসবির আনিয়া দেখাইতেছিল–তাই আমরা হাসিতেছিলাম–আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে শাহজাঁদা বাদশাহ, কি জাহাঁগীর বাদশাহর তসবির কি নাই?"

বৃদ্ধ কহিল, "থাক্‌বে না কেন মা? একখানা থাকিলে কি আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তবে আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে?"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবির সকল দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবিরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আক্‌বর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নুরজহাঁ, নুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন– বলিলেন, "ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবির আছে। হিন্দুরাজার তসবির আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা, রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল, দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীতা হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না–অসাবধানে ঘটিয়াছে–অন্য তসবিরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবির যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুশমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তসবির?

বুড়ী (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তসবির লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল–রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ।

দেখিবার যোগ্য বটে।”

সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবা পুরুষ নহে–তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তার পর লোভ পাইয়া বলিল, “ঠাকুরাণি! যদি বীরের তসবির লইতে হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?”

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার চেহারা?”

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলম্‌গীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন, “এসো, একটু আমোদ করা যাক্!”

রঙ্গপ্রিয় বয়স্যাগণ বলিল, “কি আমোদ বল! বল!”

রাজপুত্রী বলিলেন, “আমি এই আলম্‌গীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের নাতি মার। কার নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি!”

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, “অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী! কাক পক্ষীতে শুনিলেও, রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না।

হাসিয়া রাজপুত্রী চিত্রখানি মাটিতে রাখিলেন, “কে নাতি মারিবি মার!”

কেহ অগ্রসর হইল না। নির্ম্মল নাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, “অমন কথা আর বলিও না।”

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন–চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন–মড় মড় শব্দ হইল–ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

“কি সর্ব্বনাশ! কি করিলে!” বলিয়া সখীগণ শিহরিল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনই মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম।” তার পর নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, “সখি নির্ম্মল! ছেলেদের সাধ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ–”

নির্ম্মল, রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন, কথাটা সমাপ্ত হইল না–কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল–এমন প্রাণসংহারক কথাবার্ত্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে! এই সময়ে তাহার বিক্রীত তসবিরের মূল্য আসিয়া পৌঁছিল। প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নির্ম্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহার হাতে একটি আশরফি দিয়া বলিল, “আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা

শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই–এখনও উঁহার ছেলে বয়স।”

বুড়ী আশরফটি লইয়া বলিল, “তা এ কি আর বল্‌তে হয় মা! আমি তোমাদের দাসী–আমি কি আর এ সকল কথা মুখে আনি?”

নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চিত্রবিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, “নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?”

নির্ম্মল বলিল, “যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।”

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে!

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে? অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই!

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলে ঔরঙ্গজেবও হিন্দু হবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

নির্ম্মল। কিছুমাত্র আপত্তি নাই–কিন্তু ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছ, সে খবরটা লইয়া তবে মরিব।

চঞ্চলকুমারী তখন আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া দিয়া বলিল, “কোন্‌ ছবি আবার পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম? মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পারিলেই কি হয়? কোন্‌ ছবিখানা পাঁচ বার করিয়া দেখিতেছিলাম?”

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “একখানা তসবির দেখিতেছিলে, তার আর কলঙ্ক কি? রাজকুমারী, তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমার কাছে ধরা পড়িলে। কার এমন কপাল প্রসন্ন, তসবিরগুলা দেখিলে আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।”

চঞ্চলকুমারী। আকব্বর শাহের।

নির্ম্মল। আকব্বরের নামে রাজপুতনী ঝাড়ু মারে। তা ত নহেই।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী তসবিরের গোছা হাতে লইয়া খুঁজিতে লাগিল। বলিল, “তুমি যেখানি দেখিতেছিলে, তাহার উল্‌টা পিঠে একটা কালো দাগ আছে দেখিয়াছি।” সেই চিহ্ন ধরিয়া, নির্ম্মলকুমারী একখানা ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিল, বলিল, “এইখানি।”

চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল। বলিল, “তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোককে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করেছিস্‌। তুই দূর হ।”

নির্ম্মল। “দূর হব না। তা, রাজকুঙার! এ বুড়ার ছবিতে দেখিবার তুমি এত কি পেয়েছ?

চঞ্চল। বুড়ো! তোর কি চোখ গিয়েছে না কি?

নির্ম্মল চঞ্চলকে জ্বালাইতেছিল, চঞ্চলের রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। নির্ম্মল বড় সুন্দরী, মধুর সরস হাসিতে তাহার সৌন্দর্য্য বড় খুলিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “তা ছবিতে বুড়া না দেখাক—লোকে বলে, মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে।”

চঞ্চল। ও কি রাজসিংহের ছবি? তা অত কে জানে সখি?

নির্ম্মল। কাল কিনেছ—আজ কিছু জান না সখি? তা মানুষটার বয়সও হয়েছে, এমন যে খুব সুপুরুষ, তাও নয়। তবে দেখিতেছিলে কি?

চঞ্চল। গৌরা সম্‌ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা ॥
গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকীফণ্‌মে।
পবন হোয়ত আগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্‌মে ॥

নির্ম্মল। এখন, তুমি দেখিতেছি, আপনি মরিবার জন্য ফাঁদ পাতিলে। রাজসিংহকে ভজিলে, রাজসিংহকে কি কখন পাইতে পারিবে?

চঞ্চল। পাইবার জন্য কি ভজে? তুমি কি পাইবার জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে ভজিয়াছ?

নির্ম্মল। আমি ঔরঙ্গজেবকে ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল। তোমারও কি তাই?

চঞ্চল। আমারও না হয়, সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত রহিয়া গেল।

নির্ম্মল। বল কি রাজকুঙার? ছবি দেখিয়া কি এত হয়?

চঞ্চল। কিসে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি? কি হইয়াছে, তাই কি জানি?

আমরাও তাই বলি। চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা ত বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?

চঞ্চলকুমারীর মন যাই হোক্, মনের আগুনে এখন ফুঁ দিয়া সে ভাল করে নাই। কেন না, সম্মুখে বড় বিপদ্। কিন্তু সে সকল বিপদের কথা বলিতে আমাদের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আগ্রা। সে চিত্রগুলি দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে আগ্রা গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে।

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধ হয়, বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার হয় না–রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ করিল যে, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল–বুড়ী ছেলের সান্‌কির উপর একটু রসাল কাবাব তুলিয়া দিয়া বলিল, “খা! বাবাজান! খা খা লেও। য়ৈসা কাবাব রূপনগরসে আনেকে বক্‌ত এক রোজ বানা থা–ঔর কভী নেহিন্‌, বনা।”

ছেলে খাইতে খাইতে বলিল, “আম্মাজী! রূপনগরকা যো কেস্‌সা আপ্‌ ফরমায়েঙ্গে বোলী থী।”

মা বলিল, “চুপ্‌! বহ বাত্‌ মুহ্‌মে মৎ লও বাপ্‌জান্‌! মেয়্‌নে কিয়া বোলী থী? খেয়াল্‌মে বোলী থী শায়েদ্‌!”

বুড়ী এখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব্বে এক সময়ে চঞ্চলকুমারীর কথাটা তাহার উদরমধ্যে অত্যন্ত দংশন আরম্ভ করায়, তিনি পুত্রের সাক্ষাতে একটু উঃ আঃ করিয়াছিলেন। এবারকার উত্তর শুনিয়া ছেলে বলিল, “চুপ রহেঙ্গে কাহে মাজী? য়ৈসা কিয়া বাত্‌ হোগী?”

মা। শুন্‌নেকা মাফিক বাত্‌ নেহিন্‌, বাপ্‌জান্‌!

ছেলে। তব্‌ রহনে দিজিয়ে।

মা। ঔর কুছ্‌ নেহিন্‌, রূপনগরওয়ালী কুমারীন্‌কি বাত্‌।

ছেলে। বহ কুমারীন্‌ বড়া খুব্‌ সুরত? য়েহ য়ৈসা পুষিদা বাত্‌?

মা। সো নেহিন্‌–বাঁদীকি বড় দেমাগ। ইয়া আল্লা! মেয়নে কিয়া বোল্‌ চুকা!

ছেলে। কাঁহা রূপনগর গড়, কাঁহা ওঁহাকা রাজকুমারীন্‌কি দেমাগ–ইয়ে বাত্‌ আপ্‌কা বোলনাই কিয়া জরুর্‌–হামারা শুননাই কিয়া জরুর্‌?

মা। স্রেফ দেমাগ বাপ্‌জান্‌! লৌণ্ডীনে বাদ্‌শাহে আলম্‌কো নেহিন্‌ মান্‌তী!

ছেলে। বাদ্‌শাহে আলম্‌কো গালি দিই হোগী?

মা। গালি–বাপ্‌জান! উস্‌সে ভী জবর কুছ!

ছেলে। উস্‌সে ভী জবর! কিয়া হো সক্‌তা? বাদ্‌শাহ আলম্‌কো ঔর মার সক্‌তা নাই!

মা। উস্‌সে ভী জবর!

ছেলে। মার্ সে ভী জবর?
মা। বাপ্‌জান্—ঔর পুছিও মৎ—মেয়্‌নে উস্‌কী নিমক্ খাইন্।
ছেলে। নিমক্ খায়ে হো! কিস্‌তরে মা?
মা। আশরফি দিন্।
ছেলে। কাহে মাজী?
মা। উস্‌কী গুণাহ্‌কে বাত কিসিকা পাস্ বোল্‌না মনাসেব নেহিন্, এস্ লিয়ে।
ছেলে। আচ্ছা বাত হৈ। মুঝ্‌কো একঠো আশরফি বখ্‌শিশ ফর্‌মাইয়ে।
মা। কাহে রে বেটা?
ছেলে। নেহিন্, ত মুঝ্‌কো বোল দিজিয়ে বাত্‌ঠো কিয়া হৈ?
মা। বাত্ ঔর কিয়া, বাদশাহকা তসবির—তোবা! তোবা! বাত্‌ঠো আব্‌হী নিক্‌লী থী।
ছেলে। তসবির ভাঙ্গ্‌ডালা?
মা। আরে বেটা, লাথ্‌সে ভাঙ্গ্‌ডালা! তোবা! মেয়্‌নে নিমকহারামী কর্ চুকা!
ছেলে। নিমকহারামী কিয়া হৈ ইস্‌মে,—তোম্ মা, মেয়্‌নে বেটা! হামরা বোল্‌নেসে নিমকহারামী কিয়া হৈ?
মা। দেখিও বাপ্‌জান্। কিস্‌ইকো বলিও মৎ।
ছেলে। আপ্ খাতেরজমা রহিয়ে—কিস্‌ইকো পাস্ নেহিন্ বোলেঙ্গে।
তখন বুড়ী বিলক্ষণ রসরঞ্জিত করিয়া চিত্রদলনের ব্যাপারটা সমস্ত বলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দরিয়া বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম খিজির সেখ। সে তসবির আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মার কাছে দুই দিন থাকিয়া, সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম ফতেমা। খিজির, মার কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল যে, "তুমি এখনই দরিয়া বিবির কাছ যাও। এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে। ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া যায়। অতএব ফতেমা বিবি, বেপরদা না হইয়াও, দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খিজির বা ফতেমার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু দরিয়া বিবির বিশেষ পরিচয় চাহি। দরিয়া বিবির আসল নাম, দরীর-উন্নীসা কি এমনই একটা কিছু, কিন্তু সে নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না—দরিয়া বিবি বলিয়াই ডাকিত। তার বাপ মা ছিল না, কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু, কি খালা, কি এমনই একটা কি ছিল। বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ বাস করিত না। দরিয়া বিবির বয়স সতের বৎসরের বেশী নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্ব্বাকার, পনের বছরের বেশী দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল।

দরিয়া বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা দোলা করিয়া বড়মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। দুঃখী মানুষ, রাত্রি হইলে পদব্রজেও যাইত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না–বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না– কিন্তু দরিয়া বিবির সেখানে যাইবারও উপায় ছিল। তাহা পরে বলিতেছি।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল, "এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া বিবি বলিল, "রঙ্‌মহালের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে–পরওয়ানাখানা কোথায়?"

ফতেমা বলিল, "তোমারই কাছে আছে।" দরিয়া বিবি তখন পেটারা খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "এইখানা বটে!"

দরিয়া বিবি তখন কিছু সুর্‌মা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ : অদৃষ্টগণনা

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত-সৈকত পুলিনমধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে– সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদিপ্রস্তরনির্ম্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া, ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল, নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজনপরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিঞ্জিত,– এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতরগোলাপের ছড়াছড়ি,-নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা, কমনীয়কামিনীকরতলকলিত তালের চটচটা; মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নিপ্রবাহ; খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি; হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি– শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।

নগরের মধ্যে বড় গুলজার চাঁদনী চৌক। সেখানে রাজপুত বা তুর্কী অশ্বারূঢ় হইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছে। জগতে যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা দোকান সকলে থরে থরে সাজান আছে। কোথাও নর্ত্তকী রাস্তায় লোক জমাইয়া, সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে গায়িতেছে; কোথাও বাজিকর বাজি করিতেছে, প্রত্যেকের নিকট শত শত দর্শক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছে। সকলের অপেক্ষা জনতা "জ্যোতিষী"দিগের কাছে। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যেরূপ আদর ছিল, এমন বোধ হয়, আর কখনও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে তাঁহাদের তুল্য আদর করিতেন। মোগল বাদশাহেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অতিশয়

বশীভূত ছিলেন; তাঁহাদিগের গণনা না জানিয়া অনেক সময়ে অতি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।

দিল্লীর চাঁদনী চৌকে, জ্যোতিষিগণ রাজপথে আসন পাতিয়া, পুথি পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন– শত শত স্ত্রীপুরুষ আপন আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে; পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন নাই। একজন জ্যোতিষীর আসনের চারি পাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না–ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময়ে সেই স্থান দিয়া, একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলদের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য। দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্তবংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই, নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, “খাঁ সাহেব– মবারক সাহেব– মবারক!”

মবারক– অশ্বারোহীর ঐ নাম–জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি?”

যুবতী বলিল, “ইয়া আল্লা! আর কি চিনিতেও পার না?”

মবারক বলিল, “দরিয়া?”

দরিয়া বলিল, “জী।”

মবা। তুমি এখানে কেন?

দরিয়া। কেন, আমি ত সকল জায়গায় যাই। তোমার ত নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?

তারপর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, “কিছু চাই কি?”

দরিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিল, “তোবা! তোমার টাকা আমার হারাম! আমরা আতর করিতে জানি।”

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?

দরিয়া। নাম, তবে বলিব।

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল। বলিল, “এখন বল।”

দরিয়া বলিল, “এই ভিড়ের ভিতর একজন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন। ইঁহার মত জ্যোতির্ব্বিদ কখন নাকি আসে নাই। ইঁহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্‌মৎ গণাইতে হইবে।”

মবা। আমার কেস্‌মৎ জানিয়া তোমার কি হইবে? তোমার গণাও।

দরিয়া। আমার কেস্‌মৎ আমি জানিতে চাহি না। না গণাইয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তোমার কেস্‌মৎ জানাই আমার দরকার।

এই বলিয়া দরিয়া, মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মবারক বলিল, “আমার ঘোড়া ধরে কে?”

গোটাকতক ছেলে রাজপথে দাঁড়াইয়া লাড্ডু খাইতেছিল। মবারক বলিল, “তোমরা কেহ এক লহমা আমার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ। আমি আসিয়া, তোমাদের আরও লাড্ডু দিব।”

এই বলিবামাত্র দুই তিনটা ছেলে আসিয়া ঘোড়া ধরিল। একটা প্রায় নগ্ন–সে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল। মবারক তাহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না–ঘোড়া একবার পিছনের পা উঁচু করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তাহাকে ভূমিশয্যাগত দেখিয়া, অপর বালকেরা তাহার হাতের লাড্ডু কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিল। তখন মবারক নিশ্চিন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইতে গেলেন।

মবারককে দেখিয়া অপর লোক সকল পথ ছাড়িয়া দিল। দরিয়া বিবি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। জ্যোতিষীর কাছে মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিল, “আপনি গিয়া বিবাহ করুন।” পশ্চাৎ হইতে, ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া বিবি বলিল, “করিয়াছে।”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও কথা বলিল?”

মবারক বলিলেন, “ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি রকম বিবাহ হইবে?”

জ্যোতিষী বলিল, “আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।”

মবারক বলিল, “তাহা হইলে কি হইবে?

জ্যোতিষী উত্তর করিল, “তাহা হইলে, আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।”

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া বিবি বলিল, “আর মৃত্যু।”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও?”

মবা। সেই পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধ হয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া, ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষণ্নভাবে, অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক, দুর্গাভিমুখে চলিলেন। বলা বাহুল্য, বালকেরা কিছু লাড্ডু পাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসা

দরিয়ার সংবাদবিক্রয়ের কি হইল? সংবাদবিক্রয় আবার কি? কাহাকেই বা বিক্রয় করিবে? সে কথাটা বুঝাইবার জন্য, মোগলসম্রাটের অবরোধের কিছু পরিচয় দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্যশাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ ও ক্যাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগলসম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্‌আরা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী

ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন যে, তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না।

রৌশন্বারা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্বারা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশন্বারার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্বারা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।

কিন্তু রৌশন্বারার দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার একজন মহাশক্তিশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিল। ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যৈষ্ঠা জেব-উন্নিসা* বিবাহ করিলেন না। পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় বসন্তের ভ্রমরের মত পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই, মদনমন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রৌশন্বারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।

পদমর্য্যাদার কথা বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। বাদশাহের অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন কোন পুরুষ প্রবেশ করিত না, অন্ততঃ করিবার নিয়ম ছিল না। অন্তঃপুরে পাহারার কাজের জন্য একটা স্ত্রীসেনা নিযুক্ত ছিল। যেমন হিন্দুরাজগণ যবনীগণকে প্রতিহারে নিযুক্ত করিতেন, মোগল বাদশাহেরাও তাই করিতেন। তাতারজাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন; তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য, এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। এই পদে রৌশন্বারা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহসা অপার্থিব অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে জেব-উন্নিসা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ববিষয়ের কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের= সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন; প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ, সকলেই তাঁহার অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে মহাল মধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক, তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত; এক প্রণয়ভাজন ব্যক্তিগণ–অপর, যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

বলিয়াছি, জেব-উন্নিসা একজন প্রধান politician, মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর হাতে। তিনি মোগলসাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। জানা আছে, "politician" সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন–সংবাদ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। দুর্ম্মুখের মুনিব রামচন্দ্র হইতে বিস্‌মার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ। জেব-উন্নিসা এ কথাটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। চারি দিক্ হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে তসবিরওয়ালা খিজির একজন। তার মা নানা দেশে তসবির বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্‌মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই সকল

---

* মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কক্র বলেন, ইঁহার নাম ফখর-উন্নিসা ।

= বাদশাহের অন্তঃপুরকে রঙ্‌মহাল বা মহাল বলিত।

সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতি বার কিছু কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদবিক্রয়। সংবাদবিক্রয়ার্থ দরিয়া মহাল মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পান, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাঁহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া বিবি সুর্মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া বিবি রঙ্‌মহাল প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল—মবারক খাঁ রঙ্‌মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

দরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, যেখানে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ, মবারক সেইখানে গেল। দরিয়া একটা বৃক্ষবাটিকার ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঐশ্বর্য্য-নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রসাদমালার ভিতর, অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্‌মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য,—চন্দ্র সূর্য্য তথায় প্রবেশ করে না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্নখচিত, ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই; এমন নন্দনকাননিন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই—এমন উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার গর্ব্বখর্ব্বকারিণী সুন্দরীর সারি আর কোথাও নাই, এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ আমাদের উদ্দেশ্য।

অতি মনোহর বিলাসগৃহ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্ম্যতল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত কক্ষপ্রাচীর; পাথরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, রত্নের ফল, রত্নের পাখী, রত্নের ভ্রমর। কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্র দর্পণমণ্ডিত। তাহার ধারে ধারে সোণার কামদার বীট। ঊর্দ্ধে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মতির ছোট ঝালর; এবং সদ্যোনিচিত পুষ্পরাশির বড় ঝালর। হর্ম্ম্যতলে নববর্ষাসমাগমোদ্গত কোমল তৃণরাজি অপেক্ষাও সুকোমল গালিচা পাতা; তাহার উপর গজদন্তনির্ম্মিত রত্নালঙ্কৃত পালঙ্ক। তাহার উপর জরির কামদার বিছানায় জরির কামদার মখমলের বালিশ। শয্যার উপর বিবিধ পাত্রে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প, পাত্রে পাত্রে আতর গোলাপ; সুগন্ধি যত্নপ্রস্তুত তাম্বূলের রাশি। আর পৃথক্ সুবর্ণপাত্রে সুপেয় মদ্য। সকলের মধ্যে, পুষ্পরাশিকে, রত্নরাশিকে ম্লান করিয়া, প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা, পানপাত্র-হস্তে বাতায়নপথে, নিশীথ নক্ষত্রশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মৃদু পবনে পুষ্পমণ্ডিত মস্তক শীতল করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় উপস্থিত।

মবারক জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাম্বূলাদি প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালবাসে।"

মবারক বলিল, "না ডাকিতে আসিয়াছি, বেআদবি হইয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুক, না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।"

জেব-উন্নিসা। তোমার কি ভিক্ষা প্রাণাধিক!

মবারক। ভিক্ষা এই যে, যেন মোল্লার হুকুমে ঐ শব্দে আমার অধিকার হয়।

জেব-উন্নিসা হাসিয়া বলিল, "ঐ সেই পুরাতন কথা! বাদশাহজাদীরা কখন বিবাহ করে?"

মবা। তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীগণ ত বিবাহ করিয়াছে।

জেব। তাহারা শাহজাদা বিবাহ করিয়াছে। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না। বাদশাহজাদীরা দুইশতী মন্‌সবদারকে কি বিবাহ করিতে পারে?

মবা। তুমি মালেকে মুলুক। তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন, ইহা সর্ব্বলোকে জানে।

জেব। যাহা অনুচিত, তাহাতে আমি বাদশাহকে অনুরোধ করিব না।

মবা। আর এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষ বলিল, "তুমি কি বুঝিতেছ না?"

জেব-উন্নীসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত–যদি তুমি আমার কেনা–তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ!"

মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা এ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন–কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষ আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও বাদশাহজাদী করিতেন না।

মবারক একেবারে আকাশ হইতে পড়িল–এরূপ কদর্য্য কথা সে কখনও শুনে নাই। সেই পাপস্রোতোময়ী দিল্লীতেও কখনও শুনে নাই। অন্য কেহ এ কথা তাহার সম্মুখে বলিলে, সে বলিত, "তুমি বজ্রাহত হইয়া মর।" কিন্তু জেব-উন্নিসার রূপের সমুদ্রে সে ডুবিয়া গিয়াছিল–তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া রহিল।

জেব-উন্নিসা বলিতে লাগিল, "ও কথা যাক্। অন্য কথা আছে। ও কথা যেন আর কখনও না শুনি। শুনি যদি–"

মবারক। আমাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন? আমি জানি, তুমি যাহার উপর অপ্রসন্ন হইবে, এক দণ্ড তাহার কাঁধে মাথা থাকিবে না। কিন্তু ইহাও বোধ হয় তুমি জান যে, মবারক মৃত্যুকে ভয় করে না।

জেব-উন্নিসা। মরণের অপেক্ষা আর কি দণ্ড নাই?

মবা। আছে– তোমার বিচ্ছেদ।

জেব-উন্নিসা। বার বার অসঙ্গত কথা বলিলে তাহাই ঘটিতে পারে।

মবারক বুঝিলেন যে, একটা ঘটিলে দুইটাই ঘটিবে। তিনি যদি পাপিষ্ঠা বলিয়া জেব-উন্নিসাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চিত নিহত হইতে হইবে। জেব-উন্নিসা মোগল রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। খোদ ঔরঙ্গজেব তাঁহার আজ্ঞাকারী। কিন্তু সেজন্য মবারক দুঃখিত নহেন। তাঁহার দুঃখ এই যে, তিনি বাদশাহজাদীর রূপে মুগ্ধ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার তাঁহার শক্তি নাই।

অতএব মবারক বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি ইচ্ছাক্রমে যতটুকু দয়া করিবেন, তাহাতেই আমার জীবন পবিত্র। আমি যে আরও দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি,–তাহা দরিদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। কোন্ দরিদ্র না দুনিয়ার বাদশাহী কামনা করে?"

তখন প্রসন্ন হইয়া শাহজাদী মবারককে আসব পুরস্কার করিলেন। মধুর প্রণয়সম্ভাষণের পর তাহাকে আতর ও পান দিয়া বিদায় করিলেন।

মবারক রঙ্মহাল হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, দরিয়া বিবি আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইল?"

মবারক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?"

দরিয়া। সেই দরিয়া।

মবা। দুশমন! সয়তান! তুই এখানে কেন?

দরিয়া। জান না, আমি সংবাদ বেচি?

মবারক শিহরিল। দরিয়া বিবি বলিল, "রাজপুত্রীর সঙ্গে বিবাহ কি হইবে?"

মবা। রাজপুত্রী কে?

দরিয়া। শাহজাদী জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবা। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নহে?

মবা। আমি তোকে এইখানে খুন করিব।

দরিয়া। তবে আমি হাল্লা করি।

মবা। আচ্ছা, না হয়, খুন নাই করিলাম। তুই কার কাছে খবর বেচিতে আসিয়াছিস বল্।

দরিয়া। বলিব বলিয়াই দাঁড়াইয়া আছি। হজ্‌রৎ জেব-উন্নিসা বেগমের কাছে।

মবা। কি খবর বেচিবি?

দরিয়া। যে আজ তুমি বাজারে জ্যোতিষীর কাছে, আপনার কিসমত জানিতে গিয়াছিলে। তাতে জ্যোতিষী তোমাকে শাহজাদী বিবাহ করিতে বলিয়াছে। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

মবা। দরিয়া বিবি! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার উপর এই দৌরাত্ম্য করিতে প্রস্তুত?

দরিয়া। কি করিয়াছ? তুমি আমার কি না করিয়াছ? তুমি যাহা করিয়াছ, তার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কি আছে?

মবা। কেন পিয়ারি! আমার মত কত আছে।

দরিয়া। এমন পাপিষ্ঠ আর নাই।

মবা। আমি পাপিষ্ঠ নই। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এত কথা চলিতে পারে না। স্থানান্তরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি সব বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া মবারক আবার জেব-উন্নিসার কাছে ফিরিয়া গেল। জেব-উন্নিসাকে বলিল, "আমি পুনর্ব্বার আসিয়াছি, এ বেআদবি মাফ্ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে, আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রতি আপনি কোপ করিবেন না।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তোমার উপর কোপ করিবার আমার সাধ্য নাই। যদি তোমার উপর কখন রাগ করি, তবে আমিই দুঃখ পাইব। তোমার নিন্দা আমি কাণে শুনি না।"

"এ দাসের উপর এইরূপ অনুগ্রহ চিরকাল রাখিবেন" এই বলিয়া মবারক পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সংবাদবিক্রয়

যে তাতারী যুবতী, অসিচর্ম্ম হস্তে লইয়া, জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে।"

তাতারী বলিল, "তুই বেরো—আমি খবর দিব না।"

দরিয়া বলিল, "রাগ কর কেন, দোস্ত? তোমার নজরের লজ্জতেই কাবুল পঞ্জাব ফতে হয়, তার উপর আবার, হাতে ঢাল তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে?—এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর এত্তেলা কর।"

প্রহরিণী, রক্তাধরে একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকেও চিনি, তোমার পরওয়ানাও চিনি। তা এত রাত্রিতে কি আর হজরৎ বেগম সাহেবা সুর্‌মা কিনিবে? তুমি কাল সকালে এসো। এখন খসম থাকে, খসমের কাছে যাও—আর না থাকে যদি—"

দরিয়া। তুই জাহান্নামে যা। তোর ঢাল তরবার জাহান্নামে যাক্—তোর ওড়না পায়জামা জাহান্নামে যাক্—তুই কি মনে করিস্, আমি রাত দুপুরের কাজ না থাকিলে, রাত দুপুরে এয়েছি?

তখন তাতারী চুপি চুপি বলিল, "হজরৎ বেগম সাহেবা এস্ বক্‌ত কুচ মজেমে হোয়েঙ্গী।"

দরিয়া বলিল, "আরে বাঁদী, তা কি আমি জানি না? তুই মজা করিবি? হাঁ কর্।"

তখন দরিয়া, ওড়নার ভিতর হইতে এক শিশি সরাব বাহির করিল। প্রহরিণী হাঁ করিল—দরিয়া শিশি ভোর তার মুখে ঢালিয়া দিল—তাতারী শুষ্ক নদীর মত, এক নিশ্বাসে তাহা শুষিয়া লইল। বলিল, "বিস্‌মেল্লা! তৌফা সরবৎ! আচ্ছা, তুমি খাড়া থাক, আমি এত্তেলা করিতেছি।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,—মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে—আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। জেব-উন্নিসা প্রহরিণীকে দেখিয়া বলিল, "নাচ্‌নেওয়ালী লোগ্‌কো বোলাও।"

রঙ্‌মহালের সকল বেগমদিগের আমোদের জন্য এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে নৃত্যগীত হইত। জেব-উন্নিসার প্রমোদার্থ একদল নর্ত্তকী ছিল।

প্রহরিণী পুনশ্চ কর্ণিশ করিয়া বলিল, "যো হুকুম। দরিয়া বিবি হাজির, আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম—মানা শুনিতেছে না।"

জেব। কিছু বখ্‌শিশও দিয়াছে?

প্রহরিণী সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া ওড়নায় আকর্ণ মুখ ঢাকিল। তখন জেব-উন্নিসা বলিল, "আচ্ছা, নাচ্‌নেওয়ালী থাক্‌–দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।"

দরিয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল। তার পর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে দরিয়া?"

দরিয়া ফের কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "ঠিক মন্‌সবদার মবারক খাঁ সাহেবের মত হইয়াছে।"

জেব। ঠিক! তুই নিবি?

দরিয়া। কোন্‌টা দিবেন? কুকুরটা, না মানুষটা?

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিল। পরে রাগ সামলাইয়া হাসিয়া বলিল, "যেটা তোর খুসী।"

দরিয়া। তবে কুকুরটা হজরৎ বেগম সাহেবার থাক্‌–আমি মানুষটা নিব।

জেব। কুকুরটা এখন হাতে আছে–মানুষটা এখন হাতে নাই। এখন কুকুরটাই নে।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা আসবসেবনপ্রফুল্লচিত্তে যে ফুলে কুকুর গড়িয়াছিল, সেই ফুলগুলা দরিয়াকে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। দরিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া ওড়নায় তুলিল–নহিলে বেআদবি হইবে। তার পর সে বলিল, "আমি হুজুরের কৃপায় কুকুর মানুষ দুই পাইলাম।"

জেব। কিসে?

দ। মানুষটা আমার।

জেব। কিসে?

দ। আমার সঙ্গে সাদি হয়েছে।

জেব। নেকাল হিঁয়াসে।

জেব-উন্নিসা কতকগুলা ফুল ফেলিয়া সবলে দরিয়াকে প্রহার করিল।

দরিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "মোল্লা গোওয়া সব জীবিত আছে। না হয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

জেব-উন্নিসা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমার হুকুমে তাহারা শূলে যাইবে।"

দরিয়া কাঁপিল। এই ব্যাঘ্রীতুল্যা মোগল-কুমারীরা সব পারে, তা সে জানিত। বলিল, "শাহজাদী! আমি দুঃখী মানুষ, খবর বেচিতে আসিয়াছি– আমার সে সব কথার প্রয়োজন নাই।"

জেব। কি খবর– বল্‌।

দরিয়া। দুইটা আছে। একটা এই মবারক খাঁ সম্বন্ধে। আজ্ঞা না পাইলে বলিতে সাহস হয় না।

জেব। বল্‌।

দরিয়া। ইনি আজ রাত্রে চৌকে গণেশ জ্যোতিষীর কাছে আপনার কিসমত গণাইতে গিয়াছিলেন।

জেব। জ্যোতিষী কি বলিল?

দরিয়া। শাহজাদী বিবাহ কর। তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

জেব। মিছা কথা। মন্সবদার কখন্ জ্যোতিষীর কাছে গেল?

দরিয়া। এখানে আসিবার আগেই।

জেব। কে এখানে আসিয়াছিল?

দরিয়া একটু ভয় খাইল। কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তস্‌লীম দিয়া বলিল, "মবারক খাঁ সাহেব।"

জেব। তুই কেমন করিয়া জানিলি?

দরিয়া। আমি আসিতে দেখিয়াছি।

জেব। যে এ সকল কথা বলে, আমি তাহাকে শূলে দিই।

দরিয়া শিহরিল। বলিল, "বেগম সাহেবার হুজুরে ভিন্ন এ সকল কথা আমি মুখে আনি না।"

জেব। আনিলে, জল্লাদের হাতে তোমার জিব কাটাইয়া ফেলিব। তোর দোস্‌রা খবর কি বল্?

দরিয়া। দোস্‌রা খবর রূপনগরের।

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তসবির ভাঙ্গার কাহিনীটা আদ্যোপান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এ খবর আচ্ছা। কিছু বখ্‌শিশ পাইবি।"

তখন রঙমহালের খাজনাখানার উপর বখ্‌শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

তাতারী প্রতিহারী তাহাকে ধরিল। তরবারিখানা দরিয়ার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, "পালাও কোথা সখি?"

দ। কাজ হইয়াছে—ঘরে যাইব।

প্রতিহারী। টাকা পাইয়াছ—আমায় কিছু দিবে না?

দ। আমার টাকার বড় দরকার, একটা গীত শুনাইয়া যাই। সারেঙ্গ আন।

প্রতিহারীর সারেঙ্গ ছিল—মধ্যে মধ্যে বাজাইত। রঙ্‌মহালে গীতবাদ্যের বড় ধূম। সকল বেগমের এক এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী ছিল; যে অপরিণীতা গণিকাদিগের ছিল না, তাহারা আপনা আপনি যে কার্য্য সম্পন্ন করিত। রঙমহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই ছিল। দরিয়া তাতারীর সারেঙ্গ লইয়া গান করিতে বসিল। সে অতিশয় সুকণ্ঠ; সঙ্গীতে বড় পটু। অতি মধুর গায়িল। জেব-উন্নিসা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গায়?"

প্রতিহারী বলিল, "দরিয়া বিবি।"

হুকুম হইল, "উহাকে পাঠাইয়া দাও।"

দরিয়া আবার জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া কুর্ণিশ করিল। জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গা। ঐ বীণ আছে।"

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। শাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু, গায়ক-গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। দরিয়ার গীত সমাপ্ত হইলে, জেব-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মবারকের কাছে কখন গায়িয়াছিলে?"

দরিয়া। আমার এই গীত শুনিয়াই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোররা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণভূষায় লাগিয়া, কাণ কাটিয়া রক্ত পড়িল। তখন জেব-উন্নিসা তাহাকে আরও কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বলিলেন, "আর আসিস্ না।"

দরিয়া তস্‌লীম দিয়া বিদায় হইল। মনে মনে বলিল, “আবার আসিব—আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব। তোমার সর্ব্বনাশ করিব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উদিপুরী বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎপ্রথিতনামা রাজাধিরাজ, আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভাণ করিতেন—কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিতে মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।

তাঁহার মহিষীও অসংখ্য—আর সরার বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্যা বেতনভোগিনী বিলাসিনীও অসংখ্য। এই পাপিষ্ঠাদিগের সঙ্গে এই গ্রন্থের সম্বন্ধ বড় অল্প। কিন্তু কোন কোন মহিষীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মোগল বাদশাহেরা যাঁহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্যক্রমে একজন হিন্দুকন্যা তাঁহার প্রধানা মহিষী। আকব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগণের কন্যা বিবাহ করার কথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে, সকল বাদশাহেরই হিন্দুমহিষী ছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম।

যোধপুরী বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খ্রিষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইঁহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুষিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইঁহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইঁহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইঁহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন। বলিয়াছি, উদিপুরী মুসলমান ছিল না, খ্রিষ্টিয়ান। প্রবাদ আছে যে, দারাও শেষে খ্রিষ্টিয়ান হইয়াছিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারাকে পরাস্ত করিয়া, ঔরঙ্গজেব প্রথমে তাহাকে বন্দী করিয়া, পরে বধ করেন। দারাকে বধ করিয়া নরাধম ঔরঙ্গজেব এক আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। উড়িয়াদিগের কলঙ্ক আছে যে, বড় ভাই মরিলে ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া তাহার শোকাপনোদন করে। এই শ্রেণীর একজন উড়িয়াকে আমি একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম কেন কর?” সে ঝটিতি উত্তর করিল, “আজ্ঞে, ঘরের বৌ কি পরকে দিব?” ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবও বোধ হয়, সেইরূপ বিচার করিলেন। তিনি কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মানুসারে তিনি অগ্রজপত্নী বিবাহ করিতে বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রধানা মহিষীকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী হইতে আহূত করিলেন। একটি রাজপুতকন্যা; আর একজন এই উদিপুরী মহাশয়া। রাজপুতকন্যা এই আজ্ঞা পাইয়া যাহা করিল, হিন্দুকন্যা; মাত্রেই সেই অবস্থায় তাহা করিবে, কিন্তু আর কোন জাতীয়া কন্যা তাহা পারিবে না;—সে বিষ খাইয়া মরিল। খ্রিষ্টিয়ানীটা সানন্দে ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠলগ্না হইল। ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্ত্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই।

উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। দিল্লীর বাদশাহেরা মুসলমান হইয়াও অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের পৌরবর্গ এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুগামী হইতেন। রঙ্‌মহালেও এ রঙ্গের ছড়াছড়ি! এই নরকমধ্যেও উদিপুরী নাম জাহির করিয়া তুলিয়াছিল।

জেব-উন্নিসা হঠাৎ উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। কেন না, ভারতেশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী মদ্যপানে প্রায় বিলুপ্তচেতনা; বসনভূষণ কিছু বিপর্য্যস্ত, বাঁদীরা সজ্জা পুনর্বিন্যস্ত করিল, ডাকিয়া সচেতন ও সাবধান করিয়া দিল। জেব-উন্নিসা আসিয়া দেখিল, উদিপুরীর বাম হাতে সট্‌কা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে; ঝটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।

জেব-উন্নিসা আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল, “মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত?”

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে, রসনার জড়তার সহিত বলিল, “এত রাত্রে কেন?”

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোশ খবর।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া বাড়াইয়া রঙ ঢালিয়া চঞ্চলকুমারীর সেই তসবির ভাঙ্গার গল্পটা করিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, “এ আর খোশ খবর কি?”

জেব-উন্নিসা বলিল, “এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, আমি তাহা দেখিতে পারি না। রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিও।”

উদিপুরী না বুঝিয়া, নেশার ঝোঁকে বলিল, “বহুত আচ্ছা।”

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী নেশার ঝোঁকে চঞ্চলকুমারীর কথা, জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই বলিল। “সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে,” এ প্রার্থনাও জানাইল। বলিবামাত্র ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোধপুরী বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় কুটিলতা-ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ সর্ব্বদা শশব্যস্ত–যে অভেদ্য কুটিলতাজালে বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণ্য শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন–এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রসূত। তাহাতে লিখিত হইল যে, “বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবৃত্তান্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাওসাহেবের সৎস্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।”

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা দান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই

আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল। বাদশাহের বাদশাহ–যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই–তিনি জামাতা হইবেন,–চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন–ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। রাণী দেবমন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন; রাজা এই সুযোগে কোন ভূম্যধিকারীর কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন, তাহার ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ সম্বন্ধে মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার হইল। বাদশাহী রঙ্মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তিনি সেবিতা হইতেন; হিন্দুর পাক ভিন্ন ভোজন করিতেন না–এমন কি, ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। বিখ্যাত দেবদ্বেষী ঔরঙ্গজেব যে এতটা সহ্য করিতেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকেও একটু অনুগ্রহ করিতেন।

যোধপুরী বেগম এ সংবাদ শুনিলেন। বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে, বিনীতভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে–এক সামান্য বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?"

রাজেন্দ্র হাসিলেন–কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে মনে বলিলেন, "হে ভগবান! আমাকে বিধবা কর! এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ হইবে।"

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে, আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় পরিশ্রমের কাজ, বড় সাহসের কাজ, আর বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচ-পত্র দিব, বখ্শিশ দিব, আর-চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?"

দেবী বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

যোধপুরী বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ। তাঁর কাছে যাইতে হইবে। চিঠি পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিতেছি।"

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া, নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে যে, তসবির ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন, তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রূপনগরওয়ালীকে দিয়া উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না।

"আরও বলিও, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইঁহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা, বীরপুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন–যদি এক দিকে শিবজী, আর এক দিকে

রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?”

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত, তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ তক্তে বসিবে। যত দিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, তত দিন সে ভরসা করি না। একবার সে ভরসা করিয়া, রৌশন্বারার কাছে বড় মার খাইয়াছিলাম।* আজিও মুখে চোখে সে দাগ জখমের চিহ্ন আছে।

এইটুকু বলিয়া যোধপুরকুমারী একটু কাঁদিলেন। তার পর বলিলেন, “সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও।”

রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে—রৌশন্বারা তাঁকে পাখার বাতাস করিবে।

দেবী। এও কি হয় মা?

বেগম। সে কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাসমন্দিরে মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত। এবার মবারক, গালিচার উপর, জানু পাতিয়া উপবিষ্ট—যুক্তকর, ঊর্দ্ধ্বমুখ। জেব-উন্নিসা সই রত্নখচিত পালঙ্কে; মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যায় জরির কামদার বালিশের উপর হেলিয়া, সুবর্ণের আলবোলায়, রত্নখচিত নলে, তামাকু সেবন করিতেছিল। পাশ্চাত্য মহাত্মগণের কৃপায়, তামাকু তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

জেব-উন্নিসা বলিতেছেন, “সব ঠিক বলিবে?”

মবারক যুক্তকরে বলিল, “আজ্ঞা করিলেই বলিব।”

জেব। তুমি দরিয়াকে বিবাহ করিয়াছ?

মবা। যখন স্বদেশে থাকিতাম, তখন করিয়াছিলাম।

জেব। তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে?

মবা। আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক্ দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

জেব। কেন পরিত্যাগ করিয়াছ?

মবা। সে পাগল। অবশ্য তাহা আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।

---

* কথাটা ঐতিহাসিক। রৌশন্বারা যোধপুরীর নাকমুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছিল।

জেব। পাগল বলিয়া ত আমার কখনও বোধ হয় নাই।

মবা। সে আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য হুজুরে হাজির হয়। কাজের সময়ে আমিও তাহাকে কখন পাগল দেখি নাই। কিন্তু অন্য সময়ে সে পাগল। আপনি তাহাকে খান্‌খা কোন দিন আনাইয়া দেখিবেন।

জেব। তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিবে? বলিও যে, আমার কিছু ভাল সুর্‌মার প্রয়োজন আছে।

মবা। আমি কাল প্রভাতে এখান হইতে দূরদেশে কিছু দিনের জন্য যাইব।

জেব। দূরদেশে যাইবে? কৈ, সে কথা ত আমাকে কিছু বল নাই!

মবা। আজ সে কথা নিবেদন করিব ইচ্ছা ছিল।

জেব। কোথায় যাইবে?

মবা। রাজপুতানায় রূপনগর নামে গড় আছে। সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করিবার অভিপ্রায় শাহান্‌ শাহের মর্‌জি মবারকে হইয়াছে। কাল তাঁহাকে আনিবার জন্য রূপনগরে ফৌজ যাইবে। আমাকে ফৌজের সঙ্গে যাইতে হইবে।

জেব। সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। কিন্তু আগে আর একটা কথার উত্তর দাও। তুমি গণেশ জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য গণাইতে গিয়াছিলে?

মবা। গিয়াছিলাম।

জেব। কেন গিয়াছিলে?

মবা। সবাই যায়, এই জন্য গিয়াছিলাম; এ কথা বলিলেই সঙ্গত উত্তর হয়; কিন্তু তা ছাড়া আরও কারণ ছিল। দরিয়া আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

জেব। হুঁ।

এই বলিয়া জেব-উন্নিসা কিছুকাল পুষ্পরাশি লইয়া ক্রীড়া করিল। তার পর বলিল, “তুমি গেলে কেন?”

মবারক ঘটনাটা যথাযথ বিবৃত করিলেন। জেব-উন্নিসা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যোতিষী কি বলিয়াছিল যে, তুমি শাহজাদী বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে?”

মবা। হিন্দুরা শাহজাদী বলে না। জ্যোতিষী, রাজপুত্রী বলিয়াছিল।

জেব। শাহজাদী কি রাজপুত্রী নয়?

মবা। নয় কেন?

জেব। তাই কি তুমি সে দিন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে?

মবা। আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্বে হইতে এ কথা বলিতেছি।

জেব। কৈ, আমার ত স্মরণ হয় না। তা যাক–সে সকল কথাতে আর কাজ নাই। তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাতে তুমি গোসা করিও না। তোমার গোসায় আমার বড় দুঃখ হইবে। তুমি আমার প্রাণাধিক,–তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর আসিয়া বসো–আমি তোমাকে আতর মাখাই।

জেব উন্নিসা তখন মবারককে পালঙ্কের উপর বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল। তার পর বলিল, "এখন সেই রূপনগরের কথাটা বলিব। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথের বিঘ্ননিবারণের জন্য।

জেব। আলমগীর বাদশাহের ফৌজ যে কাজে যাইবে, সে কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার এরূপ অভিপ্রায় কেন হইতেছে, জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিল, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিতেছিলাম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও খুব্‌সুরৎ। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা, তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে, সে উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত দেখাইতে পারি—এই পর্‌দার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছি!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে? তা যাক্—আমি তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরী না দেখ, আমি তাহার তসবির দেখাইতেছি। কিন্তু রূপনগরীকে দেখিও। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদশাহের বেগম হইতেছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখিতে তেমন নয়—"

জেব-উন্নিসা একটু ভাবিল। মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা!

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদিগকে কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য! ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মবারক আর শুনিতে ইচ্ছা করিল না। কথা চাপা দিয়া কহিল, "যিনি বাদশাহের বেগম হইবেন, তাঁহাকে আমি দেখিব কি প্রকারে?"

জেব। কোন কল-কৌশলে।

মবা। শুনিলে বাদশাহ কি বলিবেন?

জেব। সে দায় দোষ আমার।

মবা। আপনি যা বলিবেন, তাই করিব। কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক।

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না। মর্ম্মাহত হইয়া মবারক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন–কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, "এখন উপায়?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক–আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত, তা ত জানি, কিন্তু আলম্‌গীর বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে, অন্যথা করেন? উপায় নাই, সখি!–সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়। যোধপুর বল, অম্বর বল; রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা যাহা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও পথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। বলিল, "আমি যেন উঠিয়া গেলাম–কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছি, আমাকে তাঁহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ?"

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না–রূপনগরের গড়ের একখানি পাতর থাকিবে না। তা ভাবিয়াছি–আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব। ইহা স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, "আমিও সেই পরামর্শই দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন–বলিলেন, “তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে?”

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি করিবে?”

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইল; বলিল, “দিল্লীর পথে বিষ খাইব।” নির্ম্মল জানিত, ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।

নির্ম্মল বলিল, “আর কি কোন উপায় নাই?”

চঞ্চল বলিল, “আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমায় উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার সকলই মোগলের দাস–আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে?”

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম, কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছে–কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল! আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম, প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব–তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাকা ছবিখানি উল্টাইলেন–নির্ম্মল দেখিল, সে রাজসিংহের মূর্ত্তি। চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, “দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি যদি ইঁহার শরণ লই, ইনি কি রক্ষা করিবেন না?

নির্ম্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী–চঞ্চলের সহোদরাধিকা। নির্ম্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “রাজকুমারী! যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?”

রাজকুমারী বুঝিলেন। কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি দিব সখি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা!”

নির্ম্মল। তোমার তুমিই আছ।

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “দূর হ!”

নির্ম্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। যেমন সূর্য্যোদয়কালে মেঘমালার উপর আলোর তরঙ্গের পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আসিয়া পলকে পলকে নূতন সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করে, চঞ্চলকুমারীর মুখে তেমনই পলকে পলকে সুখের, লজ্জার, সৌন্দর্য্যের নবনবোন্মেষ হইতে লাগিল। বলিল, “তাঁহাকে পাইব, আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি? আমি বিকাইতে চাহিলে তিনি কি কিনিবেন?”

নির্ম্মল। সে কথার বিচারক তিনি–আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি, বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না? গোপনে–কেহ না জানিতে পারে, এরূপ দূত কি তাঁহার কাছে যায় না?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, “তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল কথা বলিতে আমার লজ্জা করিবে।”

এমন সময়ে সখীজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।" পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন, তার কি বিশেষ দরকার আছে?" তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলি ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জিনিস আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না; কিন্তু একজন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।"

তখন আর সকলে বাহিরে গেল। দেবী–সে মতিওয়ালী দেবী ভিন্ন আর কেহ নয়–যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে?"

দেবী। যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল, দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময়ে যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গেল। মনে করিল, "কোথায় ফেলিয়া দিব,–কে কুড়াইয়া নিবে?" এই ভাবিয়া দেবী চঞ্চলকুমারীর নিকট পাঞ্জা ফেলিয়া গেল। সে গেলে পর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "নির্ম্মল! উহাকে ডাক; সে পাঞ্জাখানা ফেলিয়া গিয়াছে।"

নির্ম্মল। ফেলিয়া যায় নাই–বোধ হইল যেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছে।

চঞ্চল। আমি নিয়া কি করিব?

নির্ম্মল। এখন রাখ, কোন সময়ে না কোন সময়ে যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পারিবে।

চঞ্চল। তা যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। আমরা দুইটি বালিকায় কি পরামর্শ করিতেছিলাম–তা ভাল, কি মন্দ–ঘটিবে কি না ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এখন সাহস হইয়াছে। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

নির্ম্মল। সে ত অনেক কাল জানি।

এই বলিয়া নির্ম্মল হাসিল। চঞ্চলও মাথা হেঁট করিয়া হাসিল।

নির্ম্মল উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা হইল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্ব্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত।

চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিতদ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, রুদ্রাক্ষশোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মল দেখিয়াছিল যে, চঞ্চল কাঁদিতেছে, কিন্তু আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাঁদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,— আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথখরচটা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিল। তাহাতে আশরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আশরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "পথে অন্নই খাইতে হইবে—আশরফি খাইতে পারিব না। একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও, আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, "আমি বালিকা—পুরস্ত্রী; তাঁহার কাছে অপরিচিতা—কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জারই বা স্থান কই? লিখিব।"

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলি বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্র ঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না। রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ পর্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য প্রার্থিত হইলেন। রাজাও পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও নির্ম্মল দুই জনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্র ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিশ্র ঠাকুরের নারায়ণস্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্ঠি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, "কেন যাইবে?" মিশ্র ঠাকুর বলিলেন, "রাণার কাছে কিছু বৃত্তি পাইব।" গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন, বিরহযন্ত্রণা আর তাঁহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশাস্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহ্নি বার কত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্র ঠাকুর ভৃত্য সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে করিলে অনেক লোক সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু অধিক লোক থাকিলে কাণাকাণি হয় এজন্য লইলেন না।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্য পথ বন্ধুর, এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সে দিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারি জন বণিক্ ঐ দেবালয়ের অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন।" ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়পুর আর কত দূর?" বণিকেরা বলিল, "নিকট। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উদয়পুর পৌঁছিতে পারিব। এ সকল স্থান রাণার রাজ্য।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা চলিতেছিল। পার্ব্বত্য পথ, অতিশয় দুরারোহণীয় এবং দূরবরোহণীয়, সচরাচর বসতিশূন্য। কিন্তু এই দুর্গম পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল—এখন সমতল ভূমিতে অবরোহণ করিতে হইবে। পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয়, হরিত-বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক্ হইতে কেহ পথিককে দেখিতে পায় না; কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাঁই টাকা-কড়ি কি আছে?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, রত্নবলয় রক্ষার্থ বণিক্‌দিগকে দিই; আবার ভাবিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে, সেই মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য বাহ্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। মিশ্র ঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্র ঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর একজন তাঁহার গাঁটরি

কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং আশরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য–তাঁহার শাসনে বীরপুরুষ আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এই গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্র ঠাকুরের হস্ত পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া, পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত রত্নবলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা, অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া প্রবাহিণীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। এমন কি, কলসীপূর্ণ জল পর্য্যন্ত ছিল। দস্যুগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উদ্যোগ করিতে লাগিল। একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আশরফি কয়টি কাটিয়া চারি ভাগ করিল। এক একজন এক এক ভাগ লইল। রত্নবলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না–তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল। দলপতি বলিলেন, "কাগজে আর কি হইবে–উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া পত্র দুইখানি সেই মাণিকলালকে অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য দিল।

মাণিকলাল কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে–এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব–বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে–"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুতি হইয়া ভূতলে পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিল, চারি জনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারি জনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে, 'আমরা বণিক্।' এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারি জন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে, অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারি জনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারি জন— তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারি জনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে, যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে

লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কাষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত, অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে, রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না–এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবনদান করুন–রক্ষা করুন–আমি শরণাগত!"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন–বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই–কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন!"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা, রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার

সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।”

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, “মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।”

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, “ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?”

দস্যু বলিল, “এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।”

রাজসিংহ বলিলেন, “মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে–তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল, “ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, “মাণিকলাল–পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস–তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।”

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না–বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলকুমারীর পত্র

তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে সুমন্দ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরীবিকীর্ণকারী কুঞ্জবিহঙ্গমগণধ্বনি মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বন্য কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া, পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে। তথায়, রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠিতেছে, এবং মন প্রকৃতির বশীভূত হইতেছে। এইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন–মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ;–

“রাজন্–আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া–হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা–নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

“যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন–আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য–তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত–রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্য না হই–রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি–রাজপুতকুলতিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ্ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে, দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য, আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা–কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব? হিমালয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশিব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ব্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।

"মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। আমি জানি যে, আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কন্যা–যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান করা কলঙ্ক মনে করেন না–কলঙ্ক মনে করা দূরে থাক, বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব ঘরের কাছে কোন্ ছার? আমার এ অহঙ্কার কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ! সূর্য্যদেব অস্ত গেলে খদ্যোত কি জ্বলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদ্রিত হইলে, ক্ষুদ্র কুন্দকুসুম কি বিকশিত হয় না? যোধপুর অম্বর কুলধ্বংস করিলে রূপনগরে কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি যে, বনবাসী রাণা প্রতাপের সহিত মহারাজ মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা ভোজন করেন নাই; বলিয়াছিলেন, "যে তুর্ককে ভগিনী দিয়াছে, তাহার সহিত ভোজন করিব না।" সেই মহাবীরের বংশধরকে কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ রাজপুতকুলকামিনীর পক্ষে ইহলোকে পরলোকে ঘৃণাস্পদ? মহারাজ! আজিও আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপনারা বীর্য্যবান মহাবলপরাক্রান্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নহে। মহাবলপরাক্রান্ত রুমের বাদশাহ কিংবা পারস্যের শাহ দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রাজপুত। মহারাজ! প্রাণত্যাগ করিব, তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এই অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলম্গীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য–সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি–রাজপুতকুলের একা প্রদীপ–কেবল আপনিই স্বাধীন–কেবল উদয়পুরেশ্বরই বাদশাহের সমকক্ষ। হিন্দুকুলে আর কেহ নাই যে,–এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে–আমি আপনার শরণ লইলাম–আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

"কত বড় গুরুতর কার্য্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, তাহা আমি না জানি, এমত নহে, আমি কেবল বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিতেছি, এমত নহে। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে, তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন–আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর–আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? শুনিয়াছি না কি, মহারাষ্ট্রে এক পার্ব্বতীয় দস্যু আলম্গীরকে পরাভূত করিয়াছে–সে আলম্গীর কি রাজস্থানের রাজেন্দ্রের কাছে গণ্য?

"আপনি বলিতে পারেন, 'আমার বাহুতে বল আছে–কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? আমি কেন অপরিচিতা মুখরা কামিনীর জন্য প্রাণিহত্যা করিব?–ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব?' মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা কি রাজধর্ম্ম নহে? সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কুলকামিনীর রক্ষা কি রাজপুতের ধর্ম্ম নহে?

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা। বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না,

আমরা বলিতে পারি না। সে কথা এই–

"মহারাজ! আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগলহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রীলাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাণ্ডব দ্রোপদীলাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলীসমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্বিতীয় বীর–আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?

"তবে, আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্য না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন–তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন, পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?"

মাণিক। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। উত্তম। তুমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

এই বলিয়া রাজসিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মাতাজীকি জয়!

রাণা অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন–কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। অশ্বারোহীর যোদ্ধৃবেশ এবং তীব্রদৃষ্টিতে তিনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া, ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন–কিন্তু আর সব হারাইয়াছেন–চঞ্চলকুমারীর আশা-ভরসা হারাইয়াছেন–আর কি বলিয়া তাঁহার কাছে মুখ দেখাইবেন? ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যুসম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল নাকি? সে বার–নিকটে যাহা হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়া দস্যুরা তাঁহার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল–এবার যদি ইহারা তাঁহাকে ধরে, তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিবেন? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র, ব্রাহ্মণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল–ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল–দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন "ধর্ ধর্" করিয়া তিন চারি জন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল–ব্রাহ্মণও ছুটিলেন–অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি "নারায়ণ নারায়ণ" স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষে আর না দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে–মহারাণার ভৃত্যবর্গ। মহারাণার সহিত এ স্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে। রাজপুতগণের শিকারে বড় আনন্দ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শিকারে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। রাজসিংহ সর্ব্বদা প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না। কখন কখন অনুচরবর্গকে দূরে রাখিয়া একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল; স্বচক্ষে সকল দেখিতেন, স্বহস্তে সকল দুঃখ নিবারণ করিতেন।

অদ্য মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে। রাজা দস্যুকৃত অত্যাচার শুনিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মস্ব উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎপূর্ণ, তাহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল।

এ দিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে–ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সে দিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী। এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

এ দিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই–তৎপরিবর্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীগণ আসিয়া অধিত্যকার তলদেশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। রাণাকে দেখিতে পাইয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, তিন লম্ফে অবতরণ করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বস্ত্র রুধিরাক্ত দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, একটা কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজপুতগণের ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার–কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল; সে কোথায় গেল–কেহ দেখিয়াছিলে?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ, সে ব্যক্তি পলাইয়াছে।"

রাণা। শীঘ্র তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথা বুঝিয়া নিবেদন করিল যে, "আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহীগণ মধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবর্গ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর সকলকে বলিলেন, "প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে; তোমাদিগের সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। এই পার্ব্বত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে–লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আমার সঙ্গে আইস–আমি, এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব। যাহার সাধ না থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়া যাও।"

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি "জয় মহারাণাকি জয়! জয় মাতাজীকি জয়!" বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে, উঠিয়া "হর! হর!" শব্দে, রূপনগরের পথে ধাবিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নিরাশা

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহাধুম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত লইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ত ঠাকুরজী উদয়পুরে গিয়াছেন–এখনও তাঁর পৌঁছিবার বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে–কি হইবে সখি?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই–কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ–সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ করিব–যদি মোগলসেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখন যে আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব, আর কখন যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমত সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি–সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন। বলিলেন, "দেখি, সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না, বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার মত মোগলসেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই–বলিয়া দেন নাই যে, এত দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না; ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেও পারিলেন না। আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা ভরসা জন্মিল না।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না–মিশ্র ঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুই জনে দুই জনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" কয় দিন ধরিয়া সে এই কথায় বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।" নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?" চঞ্চল বলিল, "ছি! অমন কথা বলিও না–আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?" নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব–কেহ রাখিতে পারিবে না।"

দুই জনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মেহেরজান

যে কয় দিন, মোগল সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন, সে কয় দিন বড় আমোদ প্রমোদে কাটিল। মোগল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচ-গানের ধুম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে

নৃত্য গীতের বড় ধুম।

নর্ত্তকীদিগের মধ্যে সহসা একজনের নাম অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিল, দিল্লীতে কেহ কখন মেহেরজানের নাম শুনে নাই–কিন্তু যাহাদের নাম প্রসিদ্ধ, তাহারাও রূপনগরে আসিয়া মেহেরজানের তুল্য যশস্বিনী হইতে পারিল না। মেহেরজান আবার নর্ত্তকী হইয়াও সচ্চরিত্রা, এজন্য সে আরও যশস্বিনী হইল।

মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি তাহার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মেহেরজান প্রথমে স্বীকৃত হইল না। বলিল, "আমি অনেক লোকের সাক্ষাতে নৃত্যগীত করিতে পারি না।" সৈয়দ হাসান আলি স্বীকার করিলেন যে, বন্ধুবর্গ কেহ উপস্থিত থাকিবে না। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যগীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া নর্ত্তকীকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না। বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন, নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহিসৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি অবাক্–হতবুদ্ধি হইয়া মেহেরজানের সুন্দর সহাস্য মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মেহেরজান তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "আমি ঘোড়া, হাতিয়ার, পোষাকের দাম দিব।"

হাসান আলি বলিল, "স্ত্রীলোক অশ্বারোহী সৈনিক?"

মেহেরজান বলিল, "ক্ষতি কি? যুদ্ধ ত হইবে না। যুদ্ধ হইলেও পলাইব না।"

হাসান আলি। লোকে কি বলিবে?

মেহেরজান। আপনি আর আমি জানিলাম, আর কেহ জানিবে না।

হাসান আলি। তুমি এ কামনা কেন কর?

মেহেরজান। যে জন্যই হৌক–বাদশাহের ইহাতে ক্ষতি নাই।

হাসান আলী প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইল। মেহেরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

মেহেরজান, সেই দরিয়া বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ : প্রভুভক্তি

এই সময়ে, একবার মাণিকলালের কথা পাড়িতে হইল। মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে আবার সেই পর্ব্বতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্যুতা করিবে, এমন বাসনা ছিল না; কিন্তু পূর্ব্ববন্ধুগণ মরিল, কি বাঁচিল, তাহা দেখিবে না কেন? যদি কেহ একেবারে না মরিয়া থাকে, তবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল।

দেখিল, দুই জন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাভ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষণ্ণচিত্তে বন হইতে এক রাশি কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিল–তদ্দ্বারা দুইটি চিতা রচনা করিয়া, দুইটি মৃতদেহ তদুপরি স্থাপন করিল। গুহা হইতে প্রস্তর ও লৌহ বাহির করিয়া

অগ্ন্যুৎপাদনপূর্ব্বক চিতায় আগুন দিল। এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিম কার্য্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পরে মনে করিল যে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত মিশ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই। দেখিল, স্বচ্ছসলিলা পার্ব্বত্য নদীর জল একটু সমল হইয়াছে–এবং অনেক স্থানে বৃক্ষশাখা, লতা, গুল্ম, তৃণাদি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। এই সকল চিহ্নে মাণিকলাল মনে করিল যে, এখানে বোধ হয়, অনেক লোক আসিয়াছিল। তার পর দেখিল, পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকগুলি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়–বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে যেখানে লতাগুল্ম কাটিয়া গিয়াছে, সেখানে অর্দ্ধগোলাকৃত চিহ্নসকল স্পষ্ট। মাণিকলাল মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল যে, এখানে অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল।

চতুর মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল, অশ্বারোহীগণ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে–কোন্ দিকে গিয়াছে। দেখিল, কতকগুলি চিহ্নের সম্মুখ দক্ষিণে–কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে। কতক দূর মাত্র দক্ষিণে গিয়া চিহ্নসকল আবার উত্তরমুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিল, অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্য্যন্ত আসিয়া, আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। সে স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া আহারাদি সমাপনান্তে, কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইল। তখন মাণিকলাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না–কেবল এক পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক–মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত।

মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল, “পিসী গা?”

পিসী বলিল, “কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?”

মাণিকলাল বলিল, “আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার পিসী?”

পিসী। কতক্ষণের জন্য।

মাণিক। এই দুমাস ছমাসের জন্য?

পিসী। সে কি বাছা! আমি গরীব মানুষ–মেয়েকে খাওয়াব কোথা হইতে?

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি কি নাতনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না?

পিসী। সে কি কথা? দুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি সে এক মোহর দিতেছি–তুমি মেয়েটিকে দুমাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব–সেখানে আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

এই বলিয়া মাণিকলাল, রাণার প্রদত্ত আশরফির মধ্যে একটা পিসীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল এবং কন্যাকে তাঁহার কাছে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “যা! তোর দিদির কোলে গিয়া বস্।”

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে বিলক্ষণ জানিতেন যে, এক মোহরে ঐ শিশুর এক বৎসর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে–মাণিকলাল কেবল দুই মাসের করার করিতেছে, অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা। তারপর, মাণিক রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে–চাহি কি, বড়মানুষ হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দিবে না? মানুষটা হাতে থাকা ভাল।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি বাছা–তোমার মেয়ে মানুষ করিব, সে কি বড় ভারি কাজ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আয় রে জান্ আয়!" বলিয়া পিসী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল।

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল–"ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন–কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী। তার পর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে–উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল–বোধ হয়, রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন–উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তার পর দেখিলাম, উহারা উদয়পুরে যায় নাই। উত্তরমুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত রূপনগর বটে। বোধ হয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য–আমি তাঁহার কাছে যাইব–কিন্তু তাঁহারা অশ্বারোহণে গিয়াছেন–আমার পদব্রজে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তবে এক ভরসা, পার্ব্বত্য পথে অশ্ব তত দ্রুত যায় না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় দ্রুতগামী।" মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল। যথাকালে সে রূপনগরে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে দুই সহস্র মোগল অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না–কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।

একজন নাগরিককে মাণিক বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বখ্‌শিশ দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিল। পরে দিল্লীর পথে, চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছু দূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে এক স্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে দুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে–মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ–এবং দুরারোহণীয়–তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বাম দিকে পর্ব্বত, অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বাম দিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটু সূক্ষ্ম পথ আছে।

নাপোলিয়ন্ প্রভৃতি অনেক দস্যু সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। রাজা হইলে লোকে আর দস্যু বলে না। মাণিকলাল রাজা নহে–সুতরাং আমরা তাহাকে দস্যু বলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজদস্যুদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দস্যুরও সেনাপতির চক্ষু ছিল। পর্ব্বতনিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগল সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে–এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত দুরারোহণীয়; অশ্বারোহিগণের আরোহণ ও অবতরণের অনুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতসেনা থাকিবে না–কিন্তু বামের পর্ব্বত হইতে তাহাদিগের অবতরণের বড় সুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

উঠিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে করিল খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাজা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয়

হউক।”

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, “মারিও না।” মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা বলিলেন, “মারিও না। এ আমাদিগের স্বজন।” যোদ্ধৃগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বসতি বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?”

মাণিকলাল বলিল, “প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানে যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা দুই সহস্র –মহারাজের সঙ্গে এক শত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন–একদিনেই কি তাহা ভুলিব?”

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যে এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিলে?”

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়া রাণা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, “আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ–আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি–পারিবে?”

মাণিকলাল বলিল, “মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।”

রাণা বলিলেন, “আমরা এক শত যোদ্ধা মাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার–আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া, পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন। তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।”

মাণিকলাল বলিল, “আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সকল কি প্রকারে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।”

রাণা বলিলেন, “তোমাকে মোগল অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এবং যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে হইবে।” রাণা তাহাকে সবিস্তার উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, “মহারাজের জয় হউক! আমি কার্য্য সিদ্ধ করিব। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি ঘোড়া বখ্‌শিশ করুন।”

রাণা। আমরা এক শত যোদ্ধা, এক শত ঘোড়া। আর ঘোড়া নাই যে, তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়া দিতে পারিব না, আমার ঘোড়া লইতে পার।

মাণিক। তাহা প্রাণ থাকিতে লইব না। আমাকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিন।

রাণা। কোথা পাইব? যাহা আছে, তাহাতে আমাদের কুলায় না। কাহাকে নিরস্ত্র করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? আমার হাতিয়ার লইতে পার।

মাণিক। তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক দিতে আজ্ঞা হউক।

রাণা। এখানে যাহা পরিয়া আসিয়াছি, তাহা ভিন্ন আর পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব না।

মাণিক। মহারাজ! তবে অনুমতি দিউন, আমি যে প্রকারে হউক, এ সকল সংগ্রহ করিয়া লই।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "চুরি করিবে?"

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। বলিল, "আমি শপথ করিয়াছি যে, আর সে কার্য্য করিব না।"

রাণা। তবে কি করিবে?

মাণিক। ঠকাইয়া লইব।

রাণা হাসিলেন। বলিলেন, "যুদ্ধকালে সকলেই চোর–সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি–চোরের মত লুকাইয়া আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও।"

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

দশম পরিচ্ছেদ : রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপগনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়! দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে–নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে–পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য–অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া, তাম্বুলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। দেখিল, দোকানে বহুসংখ্যক দীপ বিচিত্র ফানুষমধ্য হইতে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া–নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্‌কান–তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় Obscene প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাশ্রিত"। মধ্যস্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া– দোকানের অধিকারিণী তাম্বুলবিক্রেয়ী–বয়সে ত্রিশের উপর, কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় বড়, চাহনি বড় চঞ্চল, হাসি বড় রঙ্গদার–সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমধ্যে সর্ব্বদাই খেলিতেছে–হাসির সঙ্গে সর্ব্বালঙ্কার দুলিতেছে–অলঙ্কার কতক রূপা, কতক সোণা–কিন্তু সুগঠন ও সুশোভন। মাণিকলাল, দেখিয়া শুনিয়া, পান চাহিল।

পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না–সম্মুখে একজন দাসী পান সাজিতেছে এবং বেচিতেছে–পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে–এবং মিষ্ট হাসিতেছে।

দাসী একজন পান সাজিয়া দিল। মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর রূপের প্রশংসা করিলে পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার দোকানসজ্জা ও অলঙ্কারগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল। পানওয়ালীও একটু ভিজিল। পানওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে মিঠে কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন দোকানে উঠিয়া বসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হুকা কাড়িয়া লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে মাণিকলাল পান খাইয়া দোকানের মসলা ফুরাইয়া দিল। দাসী মসলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম; আমার একটি দুশমন আছে–তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার

সহায়তা কর, তবে এক আশরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপিচুপি কি বলিল। পানওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়া–তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বলিল, "আশরফির প্রয়োজন নাই–রঙ্গই আমার পুরস্কার।"

মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তাহা নিকটস্থ বেনিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল। মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল, "হে প্রাণনাথ! তুমি যখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে। শুনিতেছি, তোমরা কাল চলিয়া যাইবে–অতএব আজ একবার অবশ্য অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। যে পত্র লইয়া যাইতেছে–তাহার সঙ্গে আসিও–সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পথ লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মুহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি?"

মা। একজন মোগল সওয়ার।

বাস্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও চিনিত না। কাহারও নাম জানে না। সে মনে ভাবিল, দুই হাজার মোগলের মধ্যে অবশ্য একজন মহম্মদ আছেই আছে–আর সকল মোগলই "খাঁ।" অতএব সাহস করিয়া "মহম্মদ খাঁ" লিখিল; লেখা হইলে মাণিকলাল বলিল, "তাহাকে এইখানে আনিব?"

পানওয়ালী বলিল, "এ ঘরে হইবে না। আর একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

তখনই দুই জনে বাজারে গিয়া আর একটা ঘর লইল। পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনাজন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল–মাণিকলাল পত্র লইয়া মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল। শিবিরমধ্যে মহাগোলযোগ–কোন শৃঙ্খলা নাই–নিয়ম নাই। তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া গিয়াছে। রঙ্গ তামাসা রোশনাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাণিকলাল মোগল দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, "মহম্মদ খাঁ কে মহাশয়? তাঁহার নামে পত্র আছে।" কেহ উত্তর দেয় না–কেহ গালি দেয়;–কেহ বলে চিনি না–" কেহ বলে খুঁজিয়া লও। শেষ একজন মোগল বলিল "মহম্মদ খাঁকে চিনি না। কিন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কি না।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল–মনে জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল–পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সে স্থান কত দূর?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর! ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

"বহুত আচ্ছা" বলিয়া খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড় ঘরের কথা–হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।"

নূতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাল কথা–জঙ্গী জোয়ান আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব? তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এই স্থানে উতারিতে হইবে। আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।"

খাঁ সাহেব নামিলেন–মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া

রমণীসম্ভাষণে যাওয়া বড় ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তাপোশের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে–আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে, চারি দিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে, এবং সম্মুখে আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত আছে। খাঁ সাহেব, জুতা খুলিয়া, তক্তাপোশে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন–পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে পুরিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন। বিবিও তাঁহাকে দুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত করিল।

তামাকু ধরিতে না ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, "কে ও?"

মাণিক বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি।"

তখন চতুরা রমণী অতি ভীতকণ্ঠে খাঁ সাহেবকে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে–আমার স্বামী আসিয়াছেন–মনে করিয়াছিলাম, তিনি আজ আর আসিবেন না। তুমি এই তক্তাপোশের নীচে একবার লুকাও। আমি উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

মোগল বলিল, "সে কি? মরদ হইয়া ভয়ে লুকাইব; যে হয় আসুক না; এখনই কোতল করিব।"

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, "সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ করিবে? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্তাপোশের নীচে যাও। আমি এখনই উঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অগত্যা খাঁ সাহেব তক্তাপোশের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল–কি করে–প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। সে স্থূল মাংসপিণ্ড তক্তাপোশতলে বিন্যস্ত হইলে পর পানওয়ালী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে পানওয়ালী পূর্ব্বশিক্ষামত বলিল, "তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে না বলিয়াছিলে যে?"

মাণিকলাল পূর্ব্বমত বিকৃতস্বরে বলিল, "চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি।"

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটি হস্তে লইল। পোষাক লইয়া দুই জনে বাহিরে চলিয়া আসিয়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব তখন তক্তাপোশের নীচে মূষিকদিগের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমানশিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল সৈন্য সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহদ্বার হইতে, উষ্ণীয়কবচশোভিত, গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত, অস্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল সারি দিল। পাঁচ পাঁচ জন অশ্বারোহীর এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার সারি, সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণীসমাকুল ফুল্লকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোভিতেছিল। তাহাদের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বল্গারোধে অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রুজল চক্ষুঃমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।" চঞ্চল বলল, "পরাও! পরাও! নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজ্য? রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরা।" নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুসুমিত-তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চল তার পর বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না! কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ, ক্ষুদ্র কাটার গাছ যেখানে জন্মে, সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে থাকিতে পাইলাম না!"

নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না, চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে গেলেন। নিত্যব্রত শিবপূজা ভক্তিভাবে করিলেন। পূজান্তে বলিলেন, "দেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বালিকার মরণে তোমার এত তুষ্টি কেন? প্রভু! আমি বাঁচিলে কি তোমার সৃষ্টি চলিত না? যদি এতই ছিল, কেন আমাকে রাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্চলকুমারী মাতৃচরণ বন্দনা করিতে গেলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল। পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাঁদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল। চঞ্চল কাহাকে অলঙ্কার, কাহাকে খেলনা, কাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—আমি আবার আসিব।" কাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না—দেখিতেছ না, আমি পৃথিবীশ্বরী হইতে যাইতেছি।" কাহাকেও বলিলেন, "কাঁদিও না—কাঁদিলে যদি দুঃখ যাইত, তবে আমি কাঁদিয়া রূপনগরের পাহাড় ভাসাইতাম।"

সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, চঞ্চলকুমারী দোলারোহণে চলিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দোলার অগ্রে স্থাপিত হইয়াছে; এক সহস্র পশ্চাতে। রজতমণ্ডিত রত্নখচিত সে শিবিকা, বিচিত্র সুবর্ণ-খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; আসাসোঁটা লইয়া চোপদার বাগ্‌জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে আনন্দিত করিতেছে।

চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলে দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; সেনাপতি চলিবার আজ্ঞা দিলেন; তখন অকস্মাৎ মুক্তপথ তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল। বল্গা দংশিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে অশ্বশ্রেণী চলিল–অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজিল।

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান করিতেছিল। শিবিকার পশ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল–

"শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি।
ন সম্‌ঝে গোপকুমারী,
যেহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি ॥"

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!" রাজকুমারী তখন রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, আঙ্গুল-কাটা মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে এই গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল, যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ত রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল–আগে পিছে দুই সহস্র কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শব্দে রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা–একা–একা–শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল–দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ-পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্য পথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে–প্রভাতসূর্য্যকিরণে তাহাদিগের ঊর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্ম্মল একটা কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অশ্বারোহী সেনা পার্ব্বত্য পথে চলিল। যে রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশ্যমান মহোরগের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। অশ্বসকলের অসংখ্য পদবিক্ষেপধ্বনি পর্ব্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন প্রদেশে অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রের মৃদু শব্দ একত্র সমুত্থিত হইয়া রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অশ্বগণের হ্রেষারব–আর সৈনিকের ডাক-হাঁক। পর্ব্বততলে যে সকল লতা-গুল্ম

ছিল–শব্দাঘাতে তাহার পাতা সকল কাঁপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্য পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিত, তাহারা সকলে দ্রুত পলায়ন করিল। এইরূপে সমুদয় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি, তাহা কেহ বুঝিতে না বুঝিতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল–এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে দশ, পঁচিশ–তখনই একেবারে শত শত ছোট বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল–বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া, পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্ব সকল আরোহী লইয়া পলায়নের জন্য বেগবান্ হইল–কিন্তু অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ–অশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল–সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল–শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"কাহার লোগ্ হুঁসিয়ার! বাঁ রাস্তা!" মাণিকলাল হাঁকিল। যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। বাহকেরা আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত–অশ্ব সকল পাছু হঁটিয়া তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পার্ব্বত্য পথের বাম দিক্ দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সে পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব্দে পার্ব্বত্য প্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মন্‌সবদার, তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরে সমুদয় সেনা প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্ব্বপশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন–এবং স্বয়ং সর্ব্বগামী হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং দুরারোহণীয়–তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া পথ অন্ধকার করিয়াছে। রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক জন অপরের চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সম্মুখে একটি ঢিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ খণ্ড শিলা নিম্নস্থ অশ্বারোহীদিগের উপর বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবার পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী আহত বা নিহত হইতেছিল। কে মারিতেছিল, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি

কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে–অতএব মোগলেরা পলায়ন ভিন্ন অন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। যে সহস্রসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্ব্বক রন্ধ্রমুখে নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

পঞ্চাশ জন রাজপুত দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ পর্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল–আর পঞ্চাশ জন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণ কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর বিপত্তি, সেখানে মবারক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্য পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সেপথ বন্ধ করিল–তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপারে আর কিছুই নহে–কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ সৈনিকদিগকে বলিলেন–"প্রাণ যায়, সেও স্বীকার! শত সওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ঘোড়া ছাড়িয়া পাঁওদলে, এই পাথর টপকাইয়া যাও–চল, আমি যাইতেছি।" মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পথরোধক শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথমধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়া, তাহাদের নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই ভয়ঙ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অশ্ব সহিত মোগল সওয়ারগণের উপর পড়িল–নীচে যাহারা ছিল, তাহারা চাপেই মরিল। পাঁচ সাত দশ জন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহির হইয়া আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

যে মুখে মোগলেরা সেই পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিয়াছিল, মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল। যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা ভাবিল, সে পলাইতেছে। মাণিকলাল গলি হইতে বাহির হইয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আজ্ঞা দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপর উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।" তখন পাঁচ শত মোগলসেনা, "দীন্! দীন্!" শব্দ করিয়া অশ্ব সহিত বাম দিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা ছোট তোপ–সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া, যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্য রন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

তখন "দীন্! দীন্!" শব্দে পঞ্চশত অশ্বারোহী কালান্তক যমের ন্যায় পর্ব্বতে আরোহণ করিল। পর্ব্বত অনুচ্চ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে–শিখরদেশে উঠিতে

তাহাদের বড় কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত পর্ব্বতোপরি নাই। যে রন্ধ্রপথমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় দস্যু–মবারকের বিবেচনায় তাহারা রাজপুত দস্যু ভিন্ন আর কিছুই নহে–সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া, তাহাদিগের বিনাশ-সাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধ্রের ধারে ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন–চল্লিশ জনের অনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গমপথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল, পরে নামিয়াছে, তাহার সহস্র চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্ব সকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বততলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল–সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল–"দীন্! দীন্!" শব্দের সঙ্গে পর্ব্বতে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধ্রের অপর মুখে হাসান আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে–পথান্তর নাই–কেবল যমমন্দিরের পথ খোলা। রাজসিংহ স্থির করিলেন, সেই পথে যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন–"ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলান্তঃকরণে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ্ ঘটিয়াছে–পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি। এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ–দুই মুখেই কামান শুনিতেছি! দুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দাঁড়াইয়া আছে–সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই–তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব–একজনও বাঁচিব না–কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে–সে রাজপুত নহে। রাজপুতেরা শুন–এ পথে ঘোড়া ছুটে না–সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমাদেরই হইবে–তার পর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণাকি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, প্রাণরক্ষা না হউক–একটি রাজপুতও হটিবে না। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই দুই করিয়া সারি দাও।" অশ্বপৃষ্ঠে সবে একে একে যাইতেছিল–পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত চলিল–রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্নমৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজীকি জয়! কালীমায়ীকি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুতসেনা সারি দিয়াছে–মধ্যে বিশাললোচনা সহাস্যবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন–নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীর মূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন–রাজপুতেরা মনে করিল চিতোরাধিষ্ঠাত্রী, রাজপুতকুলরক্ষিণী ভগবতী এ সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন–এ ত মানবী, কিন্তু সামান্য মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দোলা কোথায়?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এই দিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারি আপনি এখানে কেন?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি–এখন একটি ভিক্ষা চাহি। আমি মুখরা–স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা, তাহা আমাতে নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা যাহা চাহি–তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

চঞ্চলকুমারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত করিয়া কাতর স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এত দূর আসিয়াছি–তোমাকে অদেয় কিছুই নাই–কি চাও, রূপনগরের কন্যে?"

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝিতে পারি নাই। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন–আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও–আমার আপত্তি নাই–কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক–তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না। যোওয়ান্ সব–আগে চল।"

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া মর্ম্মভেদী মৃদু কটাক্ষ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বাম হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব।"

রাজসিংহ তখন হাসিলেন–বলিলেন, "অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী–রমণীকুলে তুমি ধন্য। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে–নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি–ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।

চঞ্চলকুমারী হাসিল–অতিশয় প্রণয়প্রফুল্ল, ভক্তিপ্রণোদিত, সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্য্য এক কটাক্ষবাণ রাজসিংহের উপর ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "বীরচূড়ামণি! আজি হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম! যদি তোমার দাসী না হই–তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখিবে না।" প্রকাশ্যে বলিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল সৈন্যসম্মুখে চলিলাম–কাহার সাধ্য রাখে দেখি?"

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী–জীবন্ত দেবীমূর্ত্তি, রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। তাঁহাকে স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, সেই স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা রন্ধ্রমুখে চলিয়া গেল।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট, সশস্ত্র পঞ্চ শত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে সেই পথরোধকারী কামান–মনুষ্যনির্ম্মিত বজ্র, অগ্নি উদ্গীর্ণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে–তাহার সম্মুখে, রত্নমণ্ডিতা লোকাতীতা সুন্দরী দাঁড়াইল। দেখিয়া বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল–পর্ব্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে।

মনুষ্যভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।–বলিল, "এ সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন–তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “আমি সামান্যা স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে–যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।”

মবারক বলিলেন, “তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।” চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন–মবারক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, “আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন–এ কথা বিশ্বাস করেন কি?”

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক–ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল–তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।–তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম–আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশ জন মাত্র সিপাহী লইয়া আসিয়াছেন–তাঁহাদের বলবীর্য্য ত দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কি–পঞ্চাশ জন সিপাহী এত মোগল মারিল?”

চঞ্চল। বিচিত্র নহে–হলদীঘাটে ঐ রকম কি একটা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাহাই হউক–রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন–যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিল, “বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?”

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণরক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি। কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাঁহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন–সেটি পারিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন–মরিবেন।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহা স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কি না, সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে–

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে– আপনার?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। বুঝি অন্য কেহ হইলে তাহার মনে হইত, নয়ন ছাড়া আর কোথাও বিষ আছে কি? কিন্তু মবারক সে

ইতরপ্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ন্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি, আপনাকে লইয়া যাই? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না–আমরা কোন ছার? আপনি নিশ্চিত থাকুন–কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে–আমি মোগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই–যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন–তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, যুদ্ধ করুন–রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগলসেনাপতির সঙ্গে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আপনার কোমরে যে তরবারি দুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক!"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।" এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তত দিন হইতে রাজপুত কন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিকদিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই। বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই–পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল?"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল–প্রভুর আজ্ঞা ব্যতিত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া, "মাতাজীকি জয়!" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল সেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা "আল্লা–হো–আকবর্!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া–স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া–সরিতেছে না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক পক্ষ নিবৃত্ত হয়–ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।"

চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল–তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চল নড়িল না–মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল–নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, "মোগল বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না–অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা, ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।"

চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন। মবারক তখন তাঁহার নিকটে অশ্বে আরোহণ করিতেছেন মাত্র। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব! আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাকে যদি লইয়া না যান, তবে বাদশাহ কি বলিবেন?"

মবারক বলিলেন, "বাদশাহের বড় আর একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।"

চঞ্চল। সে ত পরলোকে, কিন্তু ইহলোকে?

মবারক। মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন−আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগল যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্য পথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে; জমী করিত; ডাক-হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি, সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেনা আসিলে রূপনগরের রাজা তাহাদিগকে ডাক-হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহাদিগকে ডাকিবার কারণ, মোগলসৈন্যর সম্মান ও খবরদারিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা। গোপন অভিপ্রায়−যদি মোগলসেনা হঠাৎ কোন উপদ্রব উপস্থিত করে, তবে তাহার নিবারণ। ডাকিবামাত্র রাজপুতেরা ঢাল, খাঁড়া, ঘোড়া লইয়া গড়ে উপস্থিত হইল−রাজা তাহাদিগকে অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্র দিয়া সাজাইলেন। তাহারা নানাবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মোগলসৈনিকদিগের সহিত হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসে কয় দিবস কাটাইল। তাহার পর ঐ দিবস প্রভাতে মোগলসেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল রাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়া দিবার জন্য লইয়া আসিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন।

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ। একজন মোগলসৈনিক অতিব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, "কি সংবাদ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়াছে। জুনাব্ হাসান আলি খাঁ বাহাদুর, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন−তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।" সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

মাণিকলাল বলিল, "যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর কিছু সেনা সংগ্রহ

করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার। আরও কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহস্র সৈনিক লইয়া মাণিকলাল অগ্রসর হইল; রাজা আরও সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে–বোধ হয় যেন পীড়িতা। অশ্বারোহী সৈন্য প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল–দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল–বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল না। বল নাই, ইহা দেখিয়া মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা, এখানে এ প্রকারে পড়িয়া আছ?"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার ফৌজ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।"

যুবতী বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।"

মাণিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাই হাঁটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, "তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছ?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "অনেক পথ হাঁটিয়াছি–আর পারিতেছি না।"

পথ এমন বেশী নয়–তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে না, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে?

নির্ম্মল। কি করিব–এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতেছ না?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না?

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, "ঘোড়ায়?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার?

মাণিক। হও না।

নির্ম্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে–ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায়? আমার ঘোড়ায় চড় না?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া কলের? না মাটির?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব।

নির্ম্মল, লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রূকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল, বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। শপথ কর।

মাণিক। কি শপথ করিব?

নির্ম্মল। তরবার ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষচিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

বোধ হয়, কোর্টশিপ্‌টা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই —বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—"হে প্রাণ! হে প্রাণাধিক!" সে সব কিছুই নাই—ধিক্!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, মাণিকলাল যেখানে রাজসিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তৎপ্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে, মোগলেরা রন্ধ্রের এই মুখ বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে রূপনগরে সৈন্য সংগ্রহার্থে গিয়াছিল, এবং সেই জন্য সে প্রথমেই এই দিকে রূপনগরের সেনা লইয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই হয়—মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন মাণিকলাল মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু! উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

সৈনিকেরা কেহ কেহ বলিল, "উহারা যে মুসলমান!"

মাণিকলাল বলিল, "মুসলমান কি লুঠেরা হয় না? হিন্দুই কি যত দুষ্ক্রিয়াকারী? মার।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল।

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যে দিকে পারিল, সে সেই দিকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে পারিলেন না। তখন রাজপুতেরা "মাতাজীকি জয়!" বলিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। মবারক সেনা ফিরাইতে গিয়া, সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন, রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ কাণ্ড মাণিকলাল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কিছু জান?"

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, "জানি। যখন আমি দেখিলাম যে, মহারাজ রন্ধ্রপথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরী করিতে হইয়াছে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল। আপ্যায়িত হইয়া রাণা মাণিকলালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে তাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করিলে। আজ মুসলমানকে দেখাইতাম যে, রাজপুত কেমন করিয়া মরে!"

মাণিকলাল বলিল, "মহারাজ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্য্যের মধ্যে গণনীয় নহে। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করুন।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন এ দিকের পাহাড়ের উপরে আছে–তাহাদের নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখী যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। পলায়নপরায়ণ মোগলসেনা তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। তখন মাণিকলাল রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিলেন, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে–আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিতেছ? কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও।" সৈনিকেরাও দেখিল–তাও বটে, সম্মুখশত্রু আর কেহ নাই। মাণিকলাল যে একটা কারসাজি করিয়াছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। হঠাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই দেখিয়া, তাহারা লুঠপাটে প্রবৃত্ত হইল। এবং যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে হাসিতে হাসিতে, বাদশাহের জয়ধ্বনি তুলিয়া রণজয়গর্ব্বে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দণ্ডকাল মধ্যে পার্ব্বত্য পথ জনশূন্য হইল–কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়া রহিল। দেখিয়া, উচ্চ পর্ব্বতের উপরে প্রস্তরসঞ্চালনে যে সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া, রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়পুর যাত্রা করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, তাহারাও তাঁহার সন্ধানে সেই পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন।

সকলে জুটিল—কেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, নির্ম্মলকে লইয়া বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়া, নির্ম্মলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভোজন করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল। দোলায় নির্ম্মলকে তুলিয়া, যে পথে রাণা গিয়াছেন, সে পথে না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল—বমাল সমেত ধরা পড়ে, এমন ইচ্ছা রাখে না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকে লইয়া পিসীর বাড়ী উপস্থিত হইল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা, একটা বউ এনেছি।" বধূ দেখিয়া পিসীমা কিছু বিষণ্ণ হইলেন—মনে করিলেন—লাভের যে আশা করিয়াছিলাম, বধূ বুঝি তাহার ব্যাঘাত করিবে। কি করে, দুইটা আশরফি নগদ লইয়াছে—একদিন অন্ন না দিয়া বধূকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং বলিল, "বেশ বউ।"

মাণিকলাল বলিল, "পিসী বহুর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই।"

পিসীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপত্নী। যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে—"

মাণিকলাল। তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই বিবাহ হউক।

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, "সে ত সুখের কথা—তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা বিবাহের ত কিছু খরচ চাই?"

মাণিকলাল বলিল, "তার ভাবনা কি?"

পাঠকের জানা থাকিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময় নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশরফি ফেলিয়া দিলেন, পিসীমা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটারায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন। বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল চন্দন ও পুরোহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরফিগুলি পিসীমাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল না। মাণিকলালের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মাণিকলাল রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করিলেন, এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ : শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। কেহ পর্ব্বতোপরি বাস করিবার অভিপ্রায়ে জলের জন্য এই কূপটি খনন করিয়াছিল। এক্ষণে চারি পাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন। ঘোড়া সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার

ভিতর জল ছিল না। কিন্তু পতনের আঘাতেই ঘোড়াটি মরিয়া গেল। মবারক পতনকালে সতর্ক হইয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না। যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক– তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্রে নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যেই হই, বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে, দুই চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত করিয়াছি। পাকাইয়া মজবুত করিয়াছি। তাহা কুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর–আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর! কে তুমি?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এ গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি– উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিল। দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না। কান্না আসিতে লাগিল। তখন দরিয়া একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া, শুইয়া পড়িয়া টানিতে লাগিল। মবারক উঠিল। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বিস্মিত হইল। বলিল, "এ কি? এ বেশ কেন?"

দরিয়া বলিল, "আমি বাদশাহী সওয়ার।"

মবা। কেন?

দরি। তোমারই জন্য।

মবা। কেন?

দরি। নহিলে তোমাকে আজ বাঁচাইত কে?

মবা। সেই জন্য কি দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ? সেই জন্য কি সওয়ার সাজিয়াছ? এ যে রক্ত দেখিতেছি! তুমি যে জখম হইয়াছ! কেন এ করিলে?

দরি। তোমার জন্য করিয়াছি। না করিলে, তুমি বাঁচিতে কি? শাহজাদী কেমন ভালবাসে?

মবারক ম্লানমুখে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "শাহজাদীরা ভালবাসে না।"

দরিয়া বলিল, "আমরা দুঃখী,–আমরা ভালবাসি। এখন বসো। আমি তোমার জন্য দোলা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। লইয়া আসিতেছি। তোমার চোট লাগিয়াছে–ঘোড়ায় চড়া সৎপরামর্শ হইবে না।"

যে সকল দোলা মোগল সেনার সঙ্গে ছিল, যুদ্ধে ভীত হইয়া তাহার বাহকেরা কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। দরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মবারককে কূপমগ্ন

হইতে দেখিয়া, প্রথমেই দোলার সন্ধানে গিয়াছিল। পলাতক বাহকদিগকে সন্ধান করিয়া, দুইখানা দোলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর এখন, সেই দোলা ডাকিয়া আনিল। একখানায় আহত মবারককে তুলিল, একখানায় স্বয়ং উঠিল। তখন মবারককে লইয়া দরিয়া দিল্লীর পথে চলিল। দোলায় উঠিবার সময় মবারক দরিয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দরিয়া মবারকের শুশ্রূষা করিল। দরিয়ার চিকিৎসাতেই মবারক আরোগ্য লাভ করিল।

দিল্লীতে পৌঁছিলে, মবারক দরিয়ার হাত ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল। দিন কত ইহাতে উভয়ে বড় সুখী হইল। তার পর ইহার যে ফল উপস্থিত হইল, তাহা ভয়ানক। দরিয়ার পক্ষে ভয়ানক, মবারকের পক্ষে ভয়ানক, জেব্-উন্নিসার পক্ষে ভয়ানক, ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ভয়ানক। সে অপূর্ব্ব রহস্য আমি পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজসিংহের পরাভব

রাজসিংহ উদয়পুরে আসিলেন বলিয়াছি। চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ, এজন্য চঞ্চলকুমারীকেও উদয়পুরে লইয়া আসিয়া রাজাবরোধে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উদয়পুরে রাখিবেন, কি রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, ইহার মীমাংসা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি যত দিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, ততদিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এ দিকে চঞ্চলকুমারী রাজার ভাবগতিক দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "রাজা যে আমাকে বিবাহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এমন ত ভাবগতিক কিছুই দেখিতেছি না। যদি না করেন, তবে কেন আমি উহার অন্তপুরে বাস করিব? যাবই বা কোথায়?"

রাজসিংহ কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, কতিপয় দিন পরে, চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে, যে পত্রখানি চঞ্চলকুমারী অনন্ত মিশ্রের হাতে পাঠাইয়াছিলেন, যাহা রাজসিংহ মাণিকলালের নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গেলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সলজ্জ এবং বিনীতভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকমনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি?"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না—নীরবে রহিলেন।

তখন রাণা চঞ্চলকুমারীর পত্রখানি বাহির করিয়া চঞ্চলকুমারীকে দেখাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার পত্র বটে?"

চঞ্চল বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাণা। কিন্তু সবটুকু এক হাতের লেখা নহে। দুই হাতের লেখা দেখিতেছি। তোমার নিজের হাতের কোন অংশ আছে কি?

চঞ্চল। প্রথম ভাগটা আমার হাতের লেখা।

রাণা। তবে শেষ ভাগটা অন্যের লেখা?

পাঠকের স্মরণ থাকিবে যে, এই শেষ অংশেই বিবাহের প্রস্তাবটা ছিল। চঞ্চলকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার হাতের নহে।"

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার সম্মতিক্রমেই ইহা লিখিত হইয়াছিল?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয় রাজগণ বিবাহার্থেই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই। তোমার জাতিকূল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা কহিয়া যুবতীসুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া, রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার রাজধর্ম্ম আপনি জানেন। আমার ধর্ম্মও আমি জানি। আমি জানি যে, যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞা মাত্র শিরোধার্য্য। আপনি যদি আমাকে রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে অবশ্য আমি যাইব। সেখানে গেলে পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন। কেন না, আমাকে রক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। যদি তাহাই অভিপ্রেত, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে যখন আমি বলিয়াছিলাম যে, 'মহারাজ! আমি দিল্লী যাইব'—তখন কেন যাইতে দিলেন না?"

রাজসিংহ। সে আমার আপনার মানরক্ষার্থ।

চঞ্চল। তার পর এখন, যে আপনার শরণ লইয়াছে, তাহাকে আবার দিল্লী যাইতে দিবেন কি?

রাজ। তাও হইতে পারে না। তবে, তুমি এইখানেই থাক।

চঞ্চল। অতিথিস্বরূপ থাকিব? না দাসী হইয়া? রূপনগরের রাজকন্যা এখানে মহিষী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

রাজ। তোমার মত লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে, রূপবতী ভার্য্যা শত্রুস্বরূপ—

"ঋণকারী পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ॥"

চঞ্চলকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "বালিকার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন—উদয়পুরের রাজমহিষীগণ সকলেই কি কুরূপা?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমার মত কেহই সুরূপা নহে।"

চঞ্চলকুমারী বলিল, "আমার বিনীত নিবেদন, কথাটা মহিষীদিগের কাছে বলিবেন না। মহারাণা রাজসিংহেরও ভয়ের স্থান থাকিতে পারে।"

রাজসিংহ উচ্চহাস্য করিলেন। চঞ্চলকুমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—এখন চাপিয়া বসিল, মনে মনে বলিল, "আর ইনি আমার কাছে মহারাণা নহেন, ইনি এখন আমার বর।"

আসন গ্রহণ করিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, "মহারাজ! বিনা আজ্ঞায় আমি যে মহারাজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইতেছে—কেন না, আমি আপনার নিকট জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় বসিলাম—শিষ্যের আসনে অধিকার আছে। মহারাজ! রূপবতী ভার্য্যা শত্রু কি প্রকারে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

রাজসিংহ। তাহা সহজে বুঝান যায়। ভার্য্যা রূপবতী হইলে, তাহার জন্য বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্য্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে। আমাদের বংশের মহারাণী পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ ত?"

চঞ্চল। ঋষিবাক্যে আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না। সুন্দরী মহিষী না থাকিলে রাজারা কি বিবাদ হইতে মুক্তি পান? আর এ পামরীর জন্য মহারাজ কেন এ কথা তুলেন? আমি সুরূপা হই, কুরূপা হই, আমার জন্য যে বিবাদ বাধিবার, তাহা ত বাধিয়াছে।

রাজসিংহ। আরও কথা আছে। রূপবতী ভার্য্যাতে পুরুষ অত্যন্ত আসক্ত হয়। ইহা রাজার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেন না, তাহাতে রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

চঞ্চল। রাজারা বহুশত মহিষী কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়াও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হয়েন না। আমার ন্যায় বালিকার প্রণয়ে মহারাণা রাজসিংহের রাজকার্য্যে বিরাগ জন্মিবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধার কথা।

রাজসিংহ। কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রে বলে, "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।"

চঞ্চল। মহারাজ কি বৃদ্ধ?

রাজ। যুবা নহি।

চঞ্চল। যাহার বাহুতে বল আছে, রাজপুতকন্যার কাছে সেই যুবা। দুর্ব্বল যুবাকে রাজপুতকন্যাগণ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য করেন।

রাজ। আমি সুরূপ নহি।

চঞ্চল। কীর্ত্তিই রাজাদিগের রূপ।

রাজ। রূপবান, বলবান, যুবা রাজপুত্রের অভাব নাই।

চঞ্চল। আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। অন্যের পত্নী হইলে দ্বিচারিণী হইব। আমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মত কথা বলিতেছি। কিন্তু মনে করিয়া দেখিবেন, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, শকুন্তলা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমারও আজ প্রায় সেই দশা। আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি রাজসমন্দরে* ডুবিয়া মরিব।

রাজসিংহ বাকযুদ্ধে এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। তবে তুমি কেবল বিপদে পড়িয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার হাত হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা রাখ কি না, আমার এই বয়সে তুমি আমাতে অনুরাগিণী হইতে পারিবে কি না, আমার মনে এই সকল সংশয় ছিল। সে সকল সংশয় আজিকার কথাবার্ত্তায় দূর হইয়াছে। তুমি আমার মহিষী হইবে। তবে একটা কথার অপেক্ষা করিতে চাই। তোমার পিতার মত হইবে কি? তাঁহার অমতে আমি বিবাহ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, যদিও তোমার পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য এবং তাঁহার সৈন্য অল্প, কিন্তু বিক্রম সোলাঙ্কি যে একজন বীরপুরুষ এবং উপযুক্ত সেনানায়ক, ইহা প্রসিদ্ধ। মোগলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিবেই বাধিবে। বাধিলে, তাঁহার সাহায্য আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া বিবাহ না করিলে তিনি কখনও আমার সহায় হইবেন না। বরং তাঁর অমতে বিবাহ করিলে তিনি মোগলের সহায় এবং আমার শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি। তিনি সম্মত হইবেন কি?

চঞ্চল। না হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমার ইচ্ছা, পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়াই আপনার চরণসেবাব্রত গ্রহণ করি। লোক পাঠান আমারও

---

* রাজসিংহের নির্ম্মিত সরোবর।

ইচ্ছা।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া, বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিল। উত্তর বড় ভয়ানক। তাহার মর্ম্ম এই–রাজসিংহকে তিনি লিখিতেছেন, "আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া, আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

"আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রিয়বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য্য কই? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও রাজপুত, মুসলমানকে কন্যা দান করিলে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না জানি। কিন্তু না দিলে মোগল রূপনগরের পাহাড়ের একখানি পাথরও রাখিবে না। যদি আমি আপনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে জানিতাম, তবে আমিও ইহাতে সম্মত হইতাম না। যখন জানিব যে, আপনার সে ক্ষমতা আছে, তখন না হয় আপনাকে কন্যাদান করিব।

"সত্য বটে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিতেন, কিন্তু এমন চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা কেহই করিতেন না। আপনি আমার কাছে লোক পাঠাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া, আমার সেনা লইয়া গিয়া আমারই কন্যা হরণ করিলেন;–নচেৎ আপনার সাধ্য হয় নাই। ইহাতে আমার কতটা অনিষ্ট সাধিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মোগল বাদশাহ মনে করিবেন, যখন আমার সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তখন আমারই কুচক্রে আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে। অতএব নিশ্চয়ই আগে রূপনগর ধ্বংস করিয়া, তবে আপনার দণ্ডবিধান করিবেন। আমিও যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু মোগলের লক্ষ লক্ষ ফৌজের কাছে কার সাধ্য অগ্রসর হয়? এই জন্য প্রায় সকল রাজপুত তাঁহার পদানত হইয়া আছে–আমি কোন্ ছার?

"জানি না, এখন তাঁহার কাছে সত্য কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইব কি না। কিন্তু আপনি যদি আমার কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সে কন্যা দিবার আর যদি পথ না থাকে, তবে আমার বা আমার কন্যার নিষ্কৃতির আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে। এবং আপনার রাজধানী শৃগাল-কুকুরের বাসভূমি হইবে।"

বিক্রম সোলাঙ্কি এই ভীষণ অভিসম্পাতের পর নীচে এক ছত্র লিখিয়া দিলেন, "যদি আপনাকে কখনও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পাই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি আপনাকে কন্যা দান করিব।"

চঞ্চলকুমারীর মাতা পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন। চঞ্চলকুমারী চারি দিক্ অন্ধকার

দেখিল।

চঞ্চলকুমারী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলে, রাণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি করিব? পরিণয় বিধেয় কি না?"

চঞ্চলকুমারী–চক্ষের এক বিন্দু, বিন্দুমাত্র জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাপের এ অভিসম্পাত মাথায় করিয়া কোন্ কন্যা বিবাহ করিতে সাহস করিবে?

রাণা। তবে যদি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় কর, তবে পাঠাইতে পারি।

চঞ্চল। কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দিল্লী যাওয়াও তাই। তাহার অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তুমিই আমার যোগ্য মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীতও তোমাকে বিবাহ করিব না। সে আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ* আমার সহায়। আমি সে যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব।

চঞ্চল। আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হইবে।

রাণা। সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব।

চঞ্চল। তত দিন?

রাণা। তত দিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদিগের ন্যায় তোমার পৃথক্ রেউলা= হইবে। মহিষীদিগের ন্যায় তোমারও দাসদাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিব। আমি প্রচার করিব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হইবে। এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদিগের ন্যায় মহারাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে। কেবল যত দিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, তত দিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কি বল?

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না।" কাজেই সম্মত হইলেন। রাজসিংহও যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তারে বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। সুখ–কেন না, মাণিকলাল রাণার কাছে অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন–অনেক টাকা হইয়াছে; তার পর, মাণিকলাল রাণার অনুগ্রহে সৈন্যমধ্যে অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; নির্ম্মলের উচ্চ অট্টালিকা, ধন, দৌলত, দাস দাসী সব হইয়াছে, এবং মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নির্ম্মল,

---

* রাণাদিগের কুলদেবতা–মহাদেব।

= অবরোধ।

চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইল। এবং চঞ্চলকুমারীর পিতামাতা, রাজসিংহ এবং চঞ্চলকুমারীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চঞ্চলকুমারীকে সে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকৃত হইল–এবং মহারাণার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। চঞ্চলকুমারী বলিল, "সে সকল কথা এখন থাক্। আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

শুনিয়া, প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে–নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এ সব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়? নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না–কোন মিছা ওজর করিল না–কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়াও বলিতে পারিল না। বলিল, "ও বেলা বলিব।"

চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; মনে মনে বলিল, "নির্ম্মলও আমায় ত্যাগ করিল! হে ভগবান! তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না।" তার পর চঞ্চলকুমারী একটু হাসিল, বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!"

নির্ম্মল অধোবদন হইল। আপনাকে শত ধিক্কার দিল; বলিল, "আমি ও বেলা আসিব, যাহাকে মালিক করিয়াছি, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চল। মেয়ে না হয়, এখানে আনিলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্ খ্যান্ প্যান্ প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে–সেটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল। গৃহে গিয়া মাণিকলালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। মাণিকলালও নির্ম্মলকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট বোধ করিল। কিন্তু সে নিতান্ত প্রভুভক্ত, আপত্তি করিল না। পিসীমা আসিয়া কন্যাটির ভার লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাস দাসী সঙ্গে লইয়া রাণার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছেন। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় লোকের ভিড়। নির্ম্মলের দোলা বহুমূল্য বস্ত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু জনমর্দ্দের শব্দে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন। একজন পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?" শুনিলেন, একজন বিখ্যাত "জ্যোতিষী," এই বাড়ীতে থাকে। সহস্র সহস্র লোক তাহার কাছে প্রত্যহ গণনা করাইতে আসে। যাহারা গণাইতে আসিয়াছে, তাহারাই ভিড় করিয়াছে, নির্ম্মল আরও শুনিলেন, এই জ্যোতিষী সকল প্রকার প্রশ্ন গণিতে পারে। এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছে, তাহা ঠিক ফলিয়াছে। নির্ম্মল তখন দাসীদিগকে বলিলেন, "সঙ্গের পাইকদিগকে বল, লোক সকল সরাইয়া দেয়। আমি ভিতরে গিয়া গণনা করাইব। কিন্তু আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।"

পাইকদিগের বল্লমের গুঁতায় লোক সকল সরিল–নির্ম্মলের শিবিকা জ্যোতিষীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যে গণাইতে বসিয়াছিল–সে উঠিয়া গেলে নির্ম্মল গিয়া প্রশ্নকর্ত্তার আসনে বসিল। জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী অগ্রিম দিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি গণাইবে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী। প্রশ্ন। ভাল, বল।

নির্ম্মল বলিল, "আমার এক প্রিয়সখী আছেন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা।"

জ্যোতিষী আবার লিখিল। বলিল, "তার পর?"

নির্ম্মল। তাঁর কবে বিবাহ হইবে?

জ্যোতিষী আবার লিখিল। পরে খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অনেক অঙ্ক কষিল। অনেক পুথি খুলিয়া পড়িল। শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল।

নির্ম্মল বলিল, "বিবাহ হইবে না?"

জ্যোতিষী। প্রায় সেইরূপ উত্তর শাস্ত্রে লেখে।

নির্ম্মল। প্রায় কেন?

জ্যোতিষী। যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।

অসম্ভব বটে!" বলিয়া নির্ম্মল জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

চঞ্চলকুমারীর হরণে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিল, তাহাতে হয় মোগল সাম্রাজ্য, নয় রাজপুতানা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কেবল মহারাণা রাজসিংহের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এতটা হইতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য ঘটনাপরম্পরা বিবৃত করা, উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে কিছু কিছু না বলিলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বুঝা যাইবে না।

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে আবদ্ধ, কাহাকে বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রধান অপরাধী–চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ–তাঁহাদের তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য। কেন না, যদিও মেবার ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বড় "কঠিন ঠাঁই।" চারি দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার প্রাচীর, রাজপুতেরা সকলেই বীরপুরুষ, এবং রাজসিংহ হিন্দুবীরচূড়ামণি। এ অবস্থায় রাজপুত কি করিতে পারে, তাহা প্রতাপসিংহ, আকব্বর শাহকেও শিখাইয়াছিল। দুনিয়ার বাদশাহকে কিল খাইয়া কিছু দিনের জন্য কিল চুরি করিতে হইল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব কাহারও উপর রাগ সহ্য করিবার লোক নহে। হিন্দুর অনিষ্ট করিতে তাঁহার জন্ম, হিন্দুর অপরাধ বিশেষ অসহ্য। একে হিন্দু মারহাট্টা পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আবার রাজপুত অপমান করিল। মারহাট্টার বড় কিছু করিতে পারেন নাই, রাজপুতের হঠাৎ কিছু করিতে পারিতেছেন না। অথচ বিষ

উদ্গীরণ করিতে হইবে। অতএব রাজসিংহের অপরাধে সমস্ত হিন্দুজাতির পীড়নই অভিপ্রেত করিলেন।

আমরা এখন ইন্‌কম্ টেক্‌শকে অসহ্য মনে করি, তাহার অধিক অসহ্য একটা "টেক্‌শ" মুসলমানি আমলে ছিল। তাহার অধিক অসহ্য–কেন না, এই "টেক্‌শ" মুসলমানকে দিতে হইত না; কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ইহার নাম জেজেয়া। পরম রাজনীতিজ্ঞ আকব্বর বাদশাহ, ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি উহা বন্ধ ছিল। এক্ষণে হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া হিন্দুর যন্ত্রণা বাড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বাদশাহ, জেজেয়ার পুনরাবির্ভাবের আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। হিন্দুরা ভীত, অত্যাচারগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত হইল। যুক্তকরে সহস্র সহস্র হিন্দু বাদশাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা ছিল না। শুক্রবারে যখন বাদশাহ মসজিদে ঈশ্বরকে ডাকিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিল। দুনিয়ার বাদশাহ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত আজ্ঞা দিলেন, "হস্তীগুলা পদতলে ইহাদিগকে দলিত করুক।" সেই বিষম জনমর্দ্দ হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিবারিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের অধীন ভারতবর্ষ জেজেয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত হিন্দুর দেবপ্রতিমা, চূর্ণীকৃত, বহুকালের গগনস্পর্শী দেবমন্দির সকল ভগ্ন ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তাহার স্থানে মুসলমানের মসজিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির গেল; মথুরায় কেশবের মন্দির গেল; বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যাহা কিছু স্থাপত্যকীর্ত্তি ছিল চিরকালের জন্য তাহা অন্তর্হিত হইল।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরাও জেজেয়া দিবে। রাজপুতানার প্রজা তাঁহার প্রজা নহে, তথাপি হিন্দু বলিয়া তাহাদের উপর এ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর সর্ব্বত্র রাজপুতানা কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অচল। জয়পুরের জয়সিংহ–যাঁহার বাহুবল মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি এক্ষণে গতাসু;–বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহন্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দিল্লীতে আবদ্ধ। সুতরাং জয়পুর জেজেয়া দিল।

যোধপুরের যশোবন্ত সিংহও লোকান্তরগত। তাঁহার রাণী এখন রাজপ্রতিনিধি। স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি বাদশাহের কর্ম্মচারীদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রীলোক যুদ্ধের ধমকে ভয় পাইলেন। রাণী জেজেয়া দিলেন না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। রাজপুতানার ইতিহাসবেত্তা সেই পত্রসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition." *পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, জেজেয়া ত দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে। রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

---

* Tod's Rajasthan—Vol. 1, page 381.

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই। চীনের সম্রাট, কি পারস্যের রাজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইলে যে উদ্যোগ করিতেন না, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগ করিলেন। অর্দ্ধেক আসিয়ার অধিপতি সের (Xerxes) যেমন ক্ষুদ্র গ্রীসরাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর সের, ক্ষুদ্র রাজা রাণা রাজসিংহকে পরাজয় করিবার জন্য সেইরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি–রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল!

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ : অরণিকাষ্ঠ–উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্ন্যুৎপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে। সেই পত্র ঔরঙ্গজেবের কাছে কে লইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কঠিন হইল। কেন না, যদিও দূত অবধ্য, তথাপি পাপে কুণ্ঠাশূন্য ঔরঙ্গজেব অনেক দূত বধ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রাণের শঙ্কা রাখে, অন্ততঃ এমন সুচতুর নয় যে, আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এমন লোককে পাঠাইতে রাজসিংহ ইচ্ছুক হইলেন না। তখন মাণিকলাল আসিয়া প্রার্থনা করিল যে, আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক। রাজসিংহ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিলেন। বলিলেন, “তুমিও কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না?”

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া বলিল, “কোথা যাব? দিল্লী? কেন?”

চঞ্চল। একবার বাদশাহের রঙ্‌মহালটা বেড়াইয়া আসিবে।

নির্ম্মল। শুনিয়াছি, সে না কি নরক।

চঞ্চল। নরকে কি কখন তোমায় যাইতে হইবে না? তুমি গরিব বেচারা মাণিকলালের উপর যে দৌরাত্ম্য কর, তাহাতে তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই।

নির্ম্মল। কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন?

চঞ্চল। সে বুঝি তোমায় গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া থাকিতে সাধিয়াছিল?

নির্ম্মল। আমি ত আর তাকে ডাকি নাই। এখন সে ভূতের বোঝা বহিয়া দিল্লী গিয়া কি করিব বলিয়া দাও।

চঞ্চল। উদিপুরীকে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া আসিতে হইবে।

নির্ম্মল। কিসের?

চঞ্চল। তামাকু সাজার।

নির্ম্মল। বটে, কথাটা মনে ছিল না। পৃথিবীশ্বরী তোমার পরিচর্য্যা না করিলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিলিবে না।

চঞ্চল। দূর হ পাপিষ্ঠা! আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশাহের বেগম আমার দাসী হইবে–নহিলে আমাকে বিষ খাইতে হইবে। গণকের ত এই গণনা।

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে?

চঞ্চল। না। আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধান। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

নির্ম্মল। তা কি প্রকারে এ কাজ পারিব, বলিয়া দাও।

চঞ্চল। আমি বলিয়া দিতেছি। তুমি জান যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোন প্রকারে, উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলাইবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হইতে কিছু ধার লইও।

নির্ম্মল। ইঃ! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে।

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মলও পত্র লইয়া চলিয়া গেল। এবং যথাকালে স্বামীর সঙ্গে, উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে দিল্লীযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অরণিকাষ্ঠ–পুরুরবা

উদ্যোগ মাণিকলালেরই বেশী। তাহার একটা নমুনা সে একদিন নির্ম্মলকুমারীকে দেখাইল। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার একটা আঙ্গুলের স্থানে আবার নূতন আঙ্গুল হইয়াছে। সে মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি?"

মাণিকলাল বলিল, "গড়াইয়াছি।"

নির্ম্মল। কিসে?

মাণিক। হাতীর দাঁতে। কল কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রঙ করাইয়াছি। ইচ্ছানুসারে খোলা যায়, পরা যায়।

নির্ম্মল। এর দরকার?

মাণিক। দিল্লীতে জানিতে পারিবে। দিল্লীতে ছদ্মবেশের দরকার হইতে পারে। আঙ্গুলকাটার ছদ্মবেশ চলে না। কিন্তু দুই রকম হইলে খুব চলে।

নির্ম্মল হাসিল। তার পর মাণিকলাল একটি পিঞ্জরমধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধে 'Carrier-pigeon' গুলির গুণ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবতের ব্যবহার চলিত ছিল। পারাবতের গুণ মাণিকলাল সবিশেষ নির্ম্মলকুমারীকে বুঝাইয়া দিলেন।

রীতি ছিল যে, দিল্লীর বাদশাহের নিকট দূত পাঠাইতে হইলে, কিছু উপঢৌকন সঙ্গে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতির রাজারাও তাহা পাঠাইতেন। রাজসিংহও কিছু দ্রব্যসামগ্রী মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। তবে অপ্রণয়ের দৌত্য, বেশী সামগ্রী পাঠাইলেন না।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, মণিরত্নখচিত কারুকার্য্যযুক্ত কতকগুলি সামগ্রী পাঠাইলেন। মাণিকলাল তাহা পৃথক বাহনে বোঝাই করিয়া লইলেন।

অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র লইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে দাস দাসী, লোকজন, হাতী ঘোড়া, উট বলদ, শকট, এক্কা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মাণিকলাল যাত্রা করিলেন। যাইতে অনেক দিন লাগিল। দিল্লীর কয় ক্রোশ মাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোকজনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর সেই পাথরের সামগ্রীগুলিও সঙ্গে লইল। গড়া আঙ্গুল খুলিয়া নির্ম্মলকুমারীর কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "কাল আসিব।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিস নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাই। বলিল, "সকলগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তারপর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে, তুমি পাথরের জিনিস কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিসে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানে আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া, একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া, ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

পরে সমস্ত ফৌজ ও রেশালা এবং নির্ম্মলকুমারীকে লইয়া পুনর্ব্বার দিল্লী গেল। এবং সেখানে যথারীতি শিবির সংস্থাপিত করিয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অগ্নিচয়ন

অপরাহ্নে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দিল্লীর বাদশাহের আমখাস অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নহে। মাণিকলাল প্রথম সোপানাবলী আরোহণ করিয়া একবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর উঠিতে হইল। একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ—আবার একপদ উঠিয়া আবার কুর্ণিশ। এইরূপ তিনবার উঠিয়া তক্তে তাউস সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহপ্রেরিত সামান্য উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিলেন। নজরের অনর্ঘ্যতা দেখিয়া ওরঙ্গজেব রুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল; একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিয়া আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহাকে উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন। এবং

আগামীকল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া মাণিকলালকে বিদায় করিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন; বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা মাণিকলালকে বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরি করিতেছিল। আহদীরা মাণিকলালকে না পাইয়া, তাঁহার শিবিরে যাহাকে যাহাকে পাইল, তাহাকে তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নির্ম্মলকুমারীকেও ধরিয়া লইয়া গেল।

কোতোয়াল, অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইলেন না। ভয়প্রদর্শন ও মারপিটেও কিছুই হইল না। তাহারা কোন সন্ধান জানে না, কি প্রকারে বলিবে?

কোতোয়াল শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন—পরদানশীন বলিয়া তাঁহাকে এতক্ষণ তফাৎ রাখা হইয়াছিল। কোতোয়াল এখন নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "রাণার এল্‌চিকে আমি চিনি না।"

কোতোয়াল। তাহার নাম মাণিকলাল সিংহ।

নির্ম্মল। মাণিকলাল সিংহকে আমি চিনি না।

কো। তুমি রাণার এল্‌চির সঙ্গে উদয়পুর হইতে আস নাই?

নি। উদয়পুর আমি কখন দেখিও নাই।

কো। তবে তুমি কে?

নি। আমি জনাব যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।

কো। জুনাব যোধপুরী বেগমের বাঁদীরা মহালের বাহিরে আসে না।

নি। আমিও কখন আসি নাই। এইবার হিন্দু এল্‌চি আসিয়াছে শুনিয়া বেগম সাহেবা আমাকে তাহার তাম্বুতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কো। সে কি? কেন?

নি। কিষণজীর চরণামৃতের জন্য। তাহা সকল রাজপুত রাখিয়া থাকে।

কো। তোমাকে ত একা দেখিতেছি। তুমি মহালের বাহিরেই বা আসিলে কি প্রকারে?

নি। ইহার বলে।

এই বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া কোতোয়াল তিন সেলাম করিল। নির্ম্মলকে বলিল, "তুমি যাও। তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

নির্ম্মল তখন বলিল, "কোতোয়াল সাহেব! আর একটু মেহেরবানি করিতে হইবে। আমি কখন মহালের বাহির হই নাই। আজ বড় ধর-পাকড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। আপনি যদি দয়া করিয়া একটা আহদী, কি পাইক সঙ্গে দেন, যে আমাকে মহাল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।"

কোতোয়াল তখনই একজন অস্ত্রধারী রাজপুরুষকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া নির্ম্মলকে বাদশাহের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না। নির্ম্মলকুমারী একটু চাতুরীর সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই পাঞ্জা দেখাইল। দেখিবামাত্র সতর্ক হইয়া, রাজমহিষী তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, "তুমি এ পাঞ্জা কোথায় পাইলে?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি সমস্ত কথা সবিস্তার বলিতেছি।"

নির্ম্মলকুমারী প্রথমে আপনার পরিচয় দিল। তার পর দেবীর রূপনগরে যাওয়ার কথা, সে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা, পাঞ্জা দেওয়ার কথা, তার পর চঞ্চল ও নির্ম্মলের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। মাণিকলালের পরিচয় দিল। মাণিকলালের সঙ্গে যে নির্ম্মল আসিয়াছিল, চঞ্চলকুমারীর পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে দিল্লীতে আসিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বলিল; যে প্রকারে উদ্ধার পাইয়া, যে কৌশলে মহাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল। শেষ বলিল, "এই পত্র কি প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব, সেই উপদেশ পাইবার জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। জেব-উন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ। তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে উপায় হইবে। এখন তুমি আমার হিন্দু বাঁদীদিগের মধ্যে থাক। হিন্দুর অন্নজল খাইতে পাইবে।"

নির্ম্মলকুমারী সম্মত হইলেন। বেগম সেইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্র–উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, একজন তুর্কী (তাতারী) প্রহরিণী সঙ্গে দিয়া জেব-উন্নিসার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নির্ম্মল জেব-উন্নিসার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আতর-গোলাপের, পুষ্পরাশির, এবং তামাকুর সদ্‌গন্ধে বিমুগ্ধ হইল। নানাবিধ রত্নরাজিখচিত হর্ম্ম্যতল, শয্যাভরণ, এবং গৃহাভরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা জেব-উন্নিসার বিচিত্র, রত্নপুষ্পমিশ্রিত অলঙ্কারপ্রভায়, চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভায় চমকিত হইল। এই সকলে সজ্জিতা পাপিষ্ঠা জেব-উন্নিসাকে দেবলোকবাসিনী অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু অপ্সরার তখন চক্ষু ঢুলু ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; দ্রাক্ষাসুধার তখন পূর্ণাধিকার। নির্ম্মলকুমারী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তিনি জড়িত রসনায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী।"

জেব। মোগল বাদশাহের তক্তে তাউস লইয়া যাইতে আসিয়াছিস?

নির্ম্মল। না। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।

জেব। চিঠি কি হইবে? পুড়াইয়া রোশনাই করিবি?

নির্ম্মল। না। উদিপুরী বেগম সাহেবাকে দিব।

জেব। সে বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে?

নির্ম্মল। বোধ হয়, বাঁচিয়া আছেন।

জেব। না। সে মরিয়া গিয়াছে। এ দাসীটাকে কেহ তাহার কাছে লইয়া যা।

জেব-উন্নিসার উন্মত্ত প্রলাপবাক্যের উদ্দেশ্য যে, ইহাকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। কিন্তু তাতারী প্রহরিণী তাহা বুঝিল না। সাদা অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদিপুরী বেগমের কাছে লইয়া গেল।

সেখানে নির্ম্মল দেখিল, উদিপুরীর চক্ষু উজ্জ্বল, হাস্য উচ্চ, মেজাজ বড় প্রফুল্ল। নির্ম্মল খুব একটা বড় সেলাম করিল। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?"

নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

উদিপুরী বলিল, "না। না। তুমি ফার্সী মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ।"

নির্ম্মলকুমারী হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লিখেতেছে? লিখিতেছে, অয় নাজ্‌নী! পিয়ারী মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস্‌ ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে।' আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সঙ্গে আল্‌বৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একটু শরাব খাইয়া লই। আপনি একটু শরাব মোলাহেজা করিবেন? আচ্ছা শরাব! ফেরেঙ্গের এল্‌চি ইহা নজর দিয়াছে। এমন শরাব আপনার মুলুকেও পয়দা হয় না।"

উদিপুরী পিয়ালা মুখে তুলিলেন, সেই অবসরে নির্ম্মলকুমারী বহির্গত হইয়া যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যোধপুরীর জিজ্ঞাসামত যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া যোধপুরী বেগম হাসিয়া বলিল, "কাল পত্রখানা ঠিক হইয়া পড়িবে। তুমি এই বেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয় স্বজন কাহাকেও পাও, তার সঙ্গে আজই দিল্লীর বাহিরে চলিয়া যাইও। যদি শিবিরে কাহাকেও না পাও, তবে ইহার সঙ্গে দিল্লীর বাহিরে যাইও। তোমার স্বামী বোধ হয়, দিল্লী ছাড়াইয়া কোথাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পথে তাঁহার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। খরচপত্র তোমার কাছে না থাকে, তবে তাহাও আমি দিতেছি। কিন্তু সাবধান! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত?"

বনাসী বলিল, "তা পারিব। কিন্তু বেগম সাহেবার দস্তখতি একখানা পরওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।"

যোধপুরী তখন বলিলেন, "যেরূপ পরওয়ানা চাহি, লিখাইয়া আন, আমি বেগম সাহেবার দস্তখত করাইতেছি।"

খোজা পরওয়ানা লিখাইয়া আনিল। তাহা সেই তাতারী প্রহরিণীর হাতে দিয়া রাজমহিষী বলিলেন, "ইহাতে বেগম সাহেবার দস্তখত করাইয়া আন।"

প্রহরিণী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করে, কিসের পরওয়ানা?"

যোধপুরী বলিলেন, "বলিও, 'আমার কোতলের পরওয়ানা।' কিন্তু কালি কলম লইয়া যাইও। আর পাঞ্জা ছেপ্‌ত করিতে ভুলিও না।"

প্রহরিণী কালি কলম সহিত পরওয়ানা লইয়া গিয়া জেব-উন্নিসার কাছে ধরিল। জেব-উন্নিসা পূর্ব্বভাবাপন্ন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের পরওয়ানা?"

প্রহরিণী বলিল,"আমার কোতলের পরওয়ানা।"

জেব। কি চুরি করেছিস?

প্রহরিণী। হজরৎ উদিপুরী-বেগমের পেশওয়াজ।

জেব। আচ্ছা করেছিস–কোতলের পর পরিস্।

এই বলিয়া বেগম সাহেবা পরওয়ানা দস্তখত করিয়া দিলেন। প্রহরিণী মোহর ছেপ্‌ত করিয়া লইয়া, যোধপুরী বেগমকে আনিয়া দিল। বনাসী সেই পরওয়ানা এবং নির্ম্মলকে লইয়া যোধপুরী মহাল হইতে যাত্রা করিল। নির্ম্মলকুমারী অতি প্রফুল্লমনে খোজার সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু সহসা সে প্রফুল্লতা দূর হইল–রঙমহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি বিপদ! পালাও! পালাও! এই বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ–স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিল–পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট, পরিণতবয়স্ক, শুভ্রবেশ একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? নির্ম্মল নিজে ভূতের ভয়ে তেমন কাতর নহে। এ জন্য সে না পলাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল–ইতিমধ্যে সেই শুভ্রবেশ পুরুষ আসিয়া, নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নির্ম্মল বলিল, "আমি যে হই না কেন?"

শুভ্রবেশী পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছিলে?"

নির্ম্মল। বাহিরে।

পুরুষ। কেন?

নি। আমার দরকার আছে।

পু। দরকার ভিন্ন কেহ কিছু করে না, তাহা আমার জানা আছে। কি দরকার?

নি। আমি বলিব না।

পু। তোমার সঙ্গে কে আসিতেছিল?

নি। আমি বলিব না।

পু। তুমি হিন্দুর মেয়ে দেখিতেছি। কি জাতি?

নি। রাজপুত।

পু। তুমি কি যোধপুরী বেগমের কাছে থাক?

নির্ম্মল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যোধপুরী বেগমের নাম কাহারও সাক্ষাতে করিবে না–কি জানি, যদি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে। অতএব বলিল, "আমি এখানে থাকি না। আজ আসিয়াছি।"

সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিয়াছ?"

নির্ম্মল মনে ভাবিল, মিথ্যা কথা কেন বলিব? এ ব্যক্তি আমার কি করিবে? কার ভয়ে রাজপুতের মেয়ে মিথ্যা বলিবে? অতএব উত্তর করিল, "আমি উদয়পুর হইতে আসিয়াছি।"

তখন সে পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন আসিয়াছ?"

নির্ম্মল ভাবিল, ইহাকে বা এত পরিচয় কেন দিব? বলিল, "আপনাকে অত পরিচয় দিয়া কি হইবে। এত জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ উত্তর করিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর করিল, "আমি আলম্‌গীর বাদশাহ।"

তখন সেই তসবির, যাহা চঞ্চলকুমারী পদাঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল, নির্ম্মলকুমারীর মনে উদয় হইল। নির্ম্মল একটু জিব কাটিয়া মনে মনে বলিল, "হাঁ, সেই ত বটে!"

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহকে রীতিমত সেলাম করিল। যুক্তকরে বলিল, "হুকুম ফরমাউন্।"

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে?"

নির্ম্মল। হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কি বলিলে? উদয়পুর হইতে উদিপুরীর কাছে? কেন?

নি। পত্র ছিল।

বা। কাহার পত্র?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র?

নি। হজরৎ বেগম সাহেবাকে তাহা দিয়াছি।

বাদশাহ বড় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে নির্ম্মলকে দাঁড় করাইয়া তাতারী প্রহরিণীদিগকে বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িও না।" নিজে উদিপুরীর শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উদিপুরী ঘোর নিদ্রাভিভূত। তাহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ

করিলেন। পত্রখানা, তখনকার রীতিমত ফার্সীতে লেখা।

পত্র পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনী তুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া ঔরঙ্গজেব বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, "তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক্—আমি এ কথার উত্তর দিব না।"

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কি এত হেমাকৎ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না?"

নির্ম্মল করযোড়ে বলিল, "দুনিয়া হুজুরের। কিন্তু রসনা আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।"

ঔরঙ্গ। তা না পারি, যে রসনার বড়াই করিতেছ, তা এখনই তাতারী প্রহরিণীর হাতে কাটিয়া ফেলিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নির্ম্মল। দিল্লীশ্বরের মর্জি! কিন্তু তাহা হইলে, যে সংবাদ আপনি খুঁজিতেছেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইবে।

ঔরঙ্গ। সেই জন্য তোমার জিভ রাখিলাম। তোমার প্রতি এই হুকুম দিতেছি যে, আগুন জ্বালিয়া তোমাকে কাপড়ে মুড়িয়া, একটু একটু করিয়া তাতারীরা পোড়াইতে থাকুক। আমার কথায় যাহা বলিবে না, আগুনের জ্বালায় তাহা বলিবে।

নির্ম্মলকুমারী হাসিল। বলিল, "হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহ কি কখনও শুনেন নাই যে, হিন্দুর মেয়ে, হাসিতে হাসিতে স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় চড়িয়া পুড়িয়া মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবন্ত পুড়িয়া মরি।"

বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে কথার মীমাংসা পরে করিব। আপাততঃ তুমি এই মহালের একটা কামরার ভিতর চাবিবন্ধ থাক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইলে কিছু খাইতে পাইবে না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায় বিবেচনা করিবে, তখন কবাটে ঘা মারিও, প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে পান আহার করিতে পাইবে।"

নির্ম্মল। শাহান্-শাহ! আপনি কখনও কি শুনেন নাই যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত নিয়ম করে? ব্রত নিয়ম জন্য এক দিন, দুই দিন, তিন দিন নিরম্বু উপবাস করে? শুনেন নাই, শরণা ধরণার জন্য অনিয়মিতকাল উপবাস করে? শুনেন নাই, তারা কখন কখন উপবাস করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা, এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন করিলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। অতএব বলিলেন, "ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন করিলাম। তোমাকে ধন দৌলত দিয়া বিদায় করিব। তুমি এ সকল কথা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ কর।"

নি। রাজপুতকন্যা যেমন মৃত্যুকে ঘৃণা করে, ধন দৌলতকেও তেমনই। সামান্যা স্ত্রীলোক আমি—নিজগুণে আমাকে বিদায় দিন।

ঔরঙ্গ। দিল্লীর বাদশাহের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নি। আছে। নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

ঔরঙ্গ। কেবল সেইটি এখন পাইতেছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা করিবার, কি ভয় করিবার কিছু নাই?

নি। প্রার্থনার আছে বৈ কি? কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

ঔরঙ্গ। এমন কি সামগ্রী?

নি। আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মকেই ভয় করি, ধর্ম্মই কামনা করি। দিল্লীর বাদশাহ ম্লেচ্ছ, আর দিল্লীর বাদশাহ ঐশ্বর্য্যশালী। দিল্লীর বাদশাহের সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন, কি লইতে পারেন?

দিল্লীশ্বর নির্ম্মলকুমারীর সাহস ও চতুরতা দেখিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কটূক্তিতে পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটে! বটে! ঐ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" তখন তিনি একজন তাতারীকে আদেশ করিলেন, "যা বাবুর্চ্চি মহল হইতে কিছু গোমাংস আনিয়া, দুই তিন জনে ধরিয়া ইহার মুখ গুঁজিয়া দে।"

নির্ম্মল তাহাতেও টলিল না। বলিল, "জানি, আপনাদিগের সে বিদ্যা আছে। সে বিদ্যার জোরেই এই সোণার হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে– নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়া দিতে হইল। শুনেন নাই কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ না লইয়া এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যগণ গোমাংস লইয়া এ ঘরে পা দেওয়ার পরেও যদি তাহা আমি মুখে দিই, তবে জীবন্তে আর আমার মুখে কেহ গোমাংস দিতে পারিবে না। জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন–পারিয়াছিলেন কি?–অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতানী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি? আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"

বাদশাহ বাক্যশূন্য। যিনি পৃথিবীপতি বলিয়া খ্যাত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব ঘোষিত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি আজ এই অনাথা, নিঃসহায় অবলার নিকট অপমানিত–পরাস্ত। ঔরঙ্গজেব পরাজয় স্বীকার করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না। আমি ইহাকে বশীভূত করিব।" প্রকাশ্যে অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি, পিয়ারী?"

নির্ম্মলকুমারী হাসিয়া বলিল, "ও কি জাঁহাপনা! আরও রাজপুত-মহিষীতে সাধ আছে না কি? তা সে সাধও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।"

ঔ। সে কথা এখন থাক। এখন তুমি কিছু দিন আমার এই রঙমহাল মধ্যে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য করিবে না?

নি। কেন আমাকে আটক করিতেছেন?

ঔ। তুমি এখন দেশে গেলে, আমার বিস্তর নিন্দা করিবে। যাহাতে তুমি আমার প্রশংসা করিতে পার, এক্ষণে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিব। পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

নি। যদি আপনি না ছাড়েন, তবে আমার যাইবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটি কথা প্রতিশ্রুত হইলেই আমি দিন কতক থাকিতে পারি।

ঔ। কি কি কথা?

নি। হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ করিব না।

ঔ। তাহা স্বীকার করিলাম।

নি। কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ করিবে না।

ঔ। তাহাও স্বীকার করিলাম।

নি। আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাকিব।

ঔ। তাহাও হইবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখিয়া দিব।

নির্ম্মলকুমারীর জন্য বাদশাহ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুনশ্চ সমিধসংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্‌মহাল মধ্যে তদারক করিলেন, কে ইহাকে অন্তঃপুর-মধ্যে আসিতে দিয়াছে। অন্তঃপুরবাসী সমস্ত খোজা, তাতারী, বাঁদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা নির্ম্মলকে আসিতে দিয়াছিল, তাহারা তাহাকে চিনিল। কিন্তু একটা গর্হিত কাজ হইয়াছে বুঝিয়া কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না। ঔরঙ্গজেব বা জেব-উন্নিসা কোন সন্ধানই পাইলেন না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "ইহাকে আসিতে দেওয়ায় তত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। তবে ইহাকে কেহ কোন প্রকার পীড়ন বা অপমান করিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে। এ যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদীদিগের পাক ও জল খাইবে, মুসলমান ইহাকে ছুঁইবে না।"

তখন নির্ম্মলকুমারীকে সকলে সেলাম করিল। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া আপন মন্দিরে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। নির্ম্মলের কাছে ভিতরের কথা কিছু পাইলেন না।

সেই দিন অপরাহ্নে একজন তাতারী প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, একজন সওদাগর পাথরের জিনিস লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহাল মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। জিনিসগুলো ভাল নহে—কোন বেগমই তাহা পসন্দ করিলেন না। আপনি কিছু লইবেন কি?

মাণিকলাল বাছিয়া বাছিয়া মন্দ জিনিস আনিয়াছিল—যে-সে বেগম যেন পসন্দ করিয়া কিনিয়া না রাখে। যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

পূর্ব্বরাত্রিতে নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে যেরূপ বাদশাহের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল, নির্ম্মল সকলই তাহা যোধপুরী বেগমের কাছে বলিয়াছিল। যোধপুরী শুনিয়া নির্ম্মলের অনেক প্রশংসা ও নির্ম্মলকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু যত্ন করিতেছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া পাথরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেতকৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র লেখ। আমি পাথরের জিনিস পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।" উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা সুবর্ণনির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে যোধপুরী অন্যের অলক্ষে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল সেই কৌটাটি না পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল, কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না, দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে জানিবার, পাঠকের প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা যাহা, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। আনুষঙ্গিক কথা পরে বুঝিতে পারিবেন। পত্র পাইয়া, নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিনেই দোকান পাট উঠাইলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এজন্য দিনকতক বিলম্ব করা স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : সমিধসংগ্রহ–জেব-উন্নিসা

এখন একবার নির্ম্মলকুমারীকে ছাড়িয়া মোগলবীর মবারকের সংবাদ লইতে হইবে। বলিয়াছি, যাহারা রূপনগর হইতে পুরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বা পদচ্যুত, কাহাকে বা দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মবারক সে শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। ঔরঙ্গজেব সকলের নিকট তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহাল রাখিয়াছিলেন।

জেব-উন্নিসাও সে সুখ্যাতি শুনিলেন। মনে করিলেন যে, মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে কিন্তু মবারক আসিল না।

মবারক দরিয়াকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার খোজা বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে এল্‌বাস পোষাক দিয়া সাজাইয়াছিল। যথাসাধ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিল। মবারক পবিত্রা, পরিণীতা পত্নী লইয়া ঘরকন্যা সাজাইতেছিল।

মবারক স্বেচ্ছাক্রমে আসিল না দেখিয়া জেব-উন্নিসা বিশ্বাসী খোজা আসীরদ্দীনের দ্বারা তাহাকে ডাকাইলেন। তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ–বাদশাহজাদী মেহেরবানী ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন–তবু নফর হাজির হয় না–বড় গোস্তাকী।

দিন কতক জেব-উন্নিসা রাগের উপর রহিলেন–মনে মনে বলিলেন, "আমার ত সকলই সমান।" কিন্তু জেব-উন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন;–ধন দৌলত, তক্তে তাউস সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

সব সমান হয় না, জেব-উন্নিসারও সব সমান নয়। কিছু দিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া–শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মবারক বলিল, "আমার বহুৎ তস্‌লিমাৎ, শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ্‌কিম্মৎ আর দুনিয়ার কিছুই নাই। কেবল এক আছে। খোদা আছেন, "দীন্" আছে। গুনাহ্‌গারী আর আমা হইতে হইবে না। আমি আর মহালের ভিতর যাইব না–আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।"

উত্তর শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহা বাদশাহী দস্তুর।

মহালমধ্যে নির্ম্মলকুমারীর অবস্থানে, জেব-উন্নিসার এ অভিপ্রায় সাধনের কিছু সুবিধা ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী, ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্রমশঃ আদরের বস্তু হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে কন্দর্প ঠাকুরের কোন কারসাজি ছিল না; কাজটা শয়তানের। ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, সুখের ও আয়েশের সময়ে, "রূপনগরী নাজ্‌নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন। কথোপকথনের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজসিংহের রাজকীয় অবস্থাঘটিত সংবাদ লওয়া। তবে চতুরচূড়ামণি ঔরঙ্গজেব এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, হঠাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তিনি যুদ্ধকালে ব্যবহার্য্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু নির্ম্মলও চতুরতায় ফেলা যায় না, সে সকল কথারই অভিপ্রায় বুঝিত এবং সকল প্রয়োজনীয় কথার মিথ্যা উত্তর দিত।

অতএব ঔরঙ্গজেব তাহার কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি মনে মনে এইরূপ বিচার করিলেন,–"মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবাইয়া দিব, তাহাতে সন্দেহই করি না–রাজসিংহের রাজ্য থাকিবে না। কিন্তু তাহাতেই আমার মান বজায় হইবে না। তাহার রূপনগরী রাণীকে না কাড়িয়া আনিতে পারিলে আমার মান বজায় হইবে না। কিন্তু রাজ্য পাইলেই যে আমি রাজমহিষীকে পাইব, এমন ভরসা করা যায় না। কেন না, রাজপুতের মেয়ে, কথায় কথায় চিতায় উঠিয়া পুড়িয়া মরে, কথায় কথায় বিষ খায়। আমার হাতে পড়িবার আগে সে শয়তানী প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু এই বাঁদীটাকে যদি হস্তগত করিতে পারি–বশীভূত করিতে পারি–তবে ইহা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিব না? এ বাঁদীটা কি বশীভূত হইবে না? আমি দিল্লীর বাদশাহ, আমি একটা বাঁদীকে বশীভূত করিতে পারিব না? না পারি, তবে আমার বাদশাহী নামোনাসেফ্।"

তার পর বাদশাহের ইঙ্গিতে জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁর বেশভূষা, এল্‌বাস পোষাক, বেগমদিগের সঙ্গে সমান হইল। নির্ম্মল যাহা বলিতেন, তাহা হইত; যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। কেবল বাহির হইতে পাইতেন না।

এ সব কথা লইয়া যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলের আন্দোলন হইত। একদা হাসিয়া নির্ম্মল, যোধপুরীকে বলিল,–

সোনে কি পিঁজিরা, সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেফ খয়ের মে।

যোধপুরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুই নিস্ কেন?"

নির্ম্মল বলিল, "উদয়পুরে গিয়া দেখাইব যে, মোগল বাদশাহকে ঠকাইয়া আনিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দাহিন হাত। ঔরঙ্গজেবের আদেশ পাইয়া, জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকে লইয়া পড়িলেন। আসল কাজটা শাহজাদীর হাতে রহিল–বাদশাহ নিজে মধুর আলাপের ভারটুকু আপন হাতে রাখিলেন। নির্ম্মলের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেন, কিন্তু তাহাও একটু বাদশাহী রকমের মাজাঘষা থাকিত–নির্ম্মল রাগ করিতে পারিত না, কেবল উত্তর করিত, তাও মেয়েলী রকম মাজাঘষা, তবে রূপনগরের পাহাড়ের কর্কশতাশূন্য নহে। এখনকার ইংরেজী রুচির সঙ্গে ঠিক মিলিবে না বলিয়া সেই বাদশাহী রুচির উদাহরণ দিতে পারিলাম না।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথম ভাগে কিছুই দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগল সৈন্যকে ডাকিয়া, চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া, রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী

যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল; মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিল না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসর পাইলে, জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের সেই ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জাহান্নামে যাইবে।" ঔরঙ্গজেব কাণ্ডটা না বুঝিলেন, তাহা নহে। জেব-উন্নিসার কুচরিত্রের কথা তিনি সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি লোক আছে, এদেশের লোকে তাহাদের বর্ণনার সময় বলে, "ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না।" মোগল বাদশাহেরা সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা কন্যা বা ভগিনীর দুশ্চরিত্র জানিতে পারিলে কন্যা কি ভগিনীকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি কন্যা বা ভগিনীর অনুগৃহীত, তাহার ঠিকানা পাইলে কোন ছলে কৌশলে তাহার নিপাত সাধন করিতেন। ঔরঙ্গজেব অনেক দিন হইতে মবারককে জেব-উন্নিসার প্রীতিভাজন বলিয়া সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন কন্যার কথায় ঠিক বুঝিলেন, বুঝি কলহ ঘটিয়াছে, তাই বাদশাহজাদী, যে পিপীলিকা তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে টিপিয়া মারিতে চাহিতেছেন। ঔরঙ্গজেব তাহাতে খুব সম্মত। কিন্তু একবার নির্ম্মলের নিজমুখে এ সকল কথা বাদশাহের শুনা কর্ত্তব্য বোধে, তিনি নির্ম্মলকে ডাকাইলেন। ভিতরের কথা নির্ম্মল কিছু জানে না বা বুঝিল না, সকল কথাই ঠিক বলিল।

যথাবিহীত সময়ে বখ্‌শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞাপ্রচার করিলেন। বখ্‌শীর আজ্ঞা পাইয়া আট জন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্‌শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে হাসিতে বখ্‌শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্‌শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে এক একটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

এখনকার দিনে যে রাজদণ্ডে প্রাণ হারায়, তাহাকে ফাঁসী যাইতে হয়, অন্য প্রকার রাজকীয় বধোপায় প্রচলিত নাই। মোগলদিগের রাজ্যে এরূপ অনেক প্রকার বধোপায় প্রচলিত ছিল। কাহারও মস্তকচ্ছেদ হইত; কেহ শূলে যাইত; কেহ হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইত; কেহ বা বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিত। যাহাকে গোপনে বধ করিতে হইবে, তাহার প্রতি বিষপ্রয়োগ হইত।

মবারক সহাস্যবদনে বখ্‌শীর কাছে উপস্থিত হইয়া এবং দুই পাশে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "কি? আমায় যাইতে হইবে?"

বখ্‌শী বিষণ্নভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম!"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এ হুকুম হইল, কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি?"

বখ্‌শী। না—আপনি কিছু জানেন না?

মবারক। এক রকম—আন্দাজী আন্দাজী। বিলম্বে কাজ কি?

বখ্‌শী। কিছু না।

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হইতে দংশন করিল।

দংশনজ্বালায় মবারক একটু মুখ বিকৃত করিলেন। বখ্‌শীকে বলিলেন, "সাহেব! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মবারক কেন মরিল, তখন মেহেরবানি করিয়া

বলিবেন, শাহজাদী আলম্, জেব-উন্নিসা বেগম সাহেবার ইচ্ছা।”

বখশী সভয়ে, অতি কাতরভাবে বলিলেন, “চুপ! চুপ! এটাও।”

যদি একটা সাপের বিষ না থাকে, এজন্য দুইটা সর্পের দ্বারা হন্য ব্যক্তিকে দংশন করান রীতি ছিল। মবারক তাহা জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল।

মবারক তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হইয়া, ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, “আল্লা আক্‌বর! যদি কখনও তোমার দয়া পাইবার যোগ্য কার্য্য করিয়া থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর।”

এইরূপে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে, তীব্র সর্পবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া, মোগলবীর মবারক আলি প্রাণত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সব সমান

রঙ্‌মহালে সকল সংবাদই আসে–সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন–তিনি নাএবে বাদশাহ। মবারকের বধসংবাদও আসিয়া পৌঁছিল।

জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল–এ শুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নখচিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কৈ শাহজাদী? হস্তিদন্তনির্ম্মিত রত্নদণ্ডভূষিত পালঙ্কে শুইলেও ত চক্ষুর জল থামে না! তুমি যদি বাহিরে গিয়া দিল্লীর সহরতলীর ভগ্ন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, কত লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া কত হাসিতেছে। তোমার মত কান্না কেহই কাঁদিতেছে না।

জেব-উন্নিসার প্রথমে কিছু বোধ হইল যে, তাঁহার আপনার সুখের হানি তিনি আপনিই করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোধ হইল যে, সব সমান নহে–বাদশাহজাদীরাও ভালবাসে; জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, নারীদেহ ধারণ করিলেই ঐ পাপকে হৃদয়ে আশ্রয় দিতে হয়। জেব-উন্নিসা আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিল, “আমি, তাকে এত ভালবাসিতাম, সে কথা এত দিন জানিতে পারি নাই কেন? কেহ তাহাকে বলিয়া দিল না যে, ঐশ্বর্য্যমদে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, রূপের গর্ব্বে তুমি অন্ধ হইয়াছিলে, ইন্দ্রিয়ের দাসী হইয়া তুমি ভালবাসাকে চিনিতে পার নাই। তোমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে–কেহ যেন তোমাকে দয়া না করে।

কেহ বলিয়া না দিক–তার নিজের মনে এ সকল কথা কিছু কিছু আপনা আপনি উদয় হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এমনও মনে হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে। যদি থাকে, তবে বড় অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে। শেষ ভয় হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরস্কার দণ্ড যদি থাকে? তাহার পাপের যদি দণ্ডদাতা কেহ থাকেন? তিনি বাদশাহজাদী বলিয়া জেব-উন্নিসাকে মার্জ্জনা করিবেন কি? সম্ভব নয়। জেব-উন্নিসার মনে ভয়ও হইল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা দ্বার খুলিয়া তাহার বিশ্বাসী খোজা আসিরদ্দীনকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাপের বিষে মানুষ মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?”

আসিরদ্দীন বলিল, “মরিলে আবার চিকিৎসা কি?”

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কাণে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই। জেব-উন্নিসা একটু হাঁপ ছাড়িল। বলিল, "হাতেম মালকে চেন?"

আসি। চিনি।

জেব। সে কোথায় থাকে?

আসি। দিল্লীতে থাকে।

জেব। বাড়ী চেন?

আসি। চিনি।

জেব। এখন সেখানে যাইতে পারিবে?

আসি। হুকুম দিলেই পারি।

জেব। আজ মবারক আলি (একটু গলা কাঁপিল) সর্পাঘাতে মরিয়াছে জান?

আসি। জানি।

জেব। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর দিবে, তাহা আমি জানি। নূতন গোর, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আশরফি দিতেছি। এক শ হাতেম মালকে দিবে, এক শ আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে, যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

আশরফি লইয়া খোজা আসিরদ্দীন তখনই বিদায় হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : সমিধ-সংগ্রহ–দরিয়া

আর একবার রঙ্মহালে পাথরের দ্রব্য বেচিয়া, মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাথরের কৌটা চাবি বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া, নির্ম্মল পাইল–সেই দৌত্য পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকানপাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। দিল্লীর অনেক "দর্ওয়াজা।" পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এজন্য মাণিকলাল আজমীর দর্ওয়াজায় না গিয়া, অন্য দর্ওয়াজায় চলিল। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থান আছে। একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া, সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল। দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল, সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তার পর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দর্ওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া, জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া

রাখিল। এবং আপনার পেঁটরা হইতে একটা ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া, তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল। তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে স্থানে একটু একটু চিরিয়া, ছিদ্রমধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিন বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃত ব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারি বারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচ বারে সে উঠিয়া বসিয়া কথা কহিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে, সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল? আপনি?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিল, "কেন বাঁচাইলেন? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন। আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল?

মবরাক। এখন বলিবার কথা নহে। সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন—উদয়পুরে?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি?

মাণিক। করিব।

মবারককে আরও কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে মাণিকলাল একটা টাটু কিনিয়া আনিল। তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া, নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিল। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছে।

এদিকে আসিরদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচান গেল না। জেব-উন্নিসা আতরমাখা রুমালখানি চক্ষুতে দিয়াছিল, এখন পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত মাথা কুটিতে লাগিল।

যে দুঃখ কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়, তাহা সহ্য করা বড়ই কষ্ট। বাদশাহজাদীর সেই দুঃখ হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিল, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!"

এই সময়ে কক্ষদ্বারে বড় গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষপ্রবেশ করিবার জন্য জিদ্ করিতেছে—প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহুৎ আচ্ছা,—চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। জেব-উন্নিসা প্রতিহারীকে ডাকিয়া উহাকে ধৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিহারী তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। প্রতিহারী তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধরিল। দরিয়া বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নগ্নাবস্থায় পলায়ন করিল। সে তখন ঘোর উন্মাদগ্রস্ত। মবারকের মৃত্যুসংবাদ সে শুনিয়াছিল।

সপ্তম খণ্ড

অগ্নি জ্বলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় Xerxes–দ্বিতীয় Plataes

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রা করিতে যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর। দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বাহ্লীক পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে কেরল ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত, যেখানে যত সেনা ছিল, সব এই মহাযুদ্ধে আহূত করিলেন। দক্ষিণাপথের মহাসৈন্য, গোলকুণ্ডা বিজয়পুর মহারাষ্ট্রের সমরের অবিশ্রান্ত বজ্রাঘাতে, দ্বিতীয় বৃত্রাসুরের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠ অশনিদুর্ভেদ্য হইয়াছিল–তাহা লইয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম, দক্ষিণ হইতে উদয়পুর ভাসাইতে আসিলেন। অন্য পুত্র আজম শাহ–বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি, পূর্ব্বভারতবর্ষের মহতী চমূ লইয়া মেবারের পর্ব্বতামালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমে মুলতান হইতে পাঞ্জাব কাবুল কাশ্মীরের অজেয় যোদ্ধৃবর্গ লইয়া, অপর পুত্র আকব্বর শাহ আসিয়া, সেনাসাগরের অনন্ত স্রোতে আপনার সেনাসাগর মিশাইলেন। উত্তরে স্বয়ং শাহান শাহ বাদশাহ দিল্লী হইতে অপরাজেয় বাদশাহী সেনা লইয়া উদয়পুরের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য মেবারে দর্শন দিলেন। সাগরমধ্যস্থ উন্নত পর্ব্বতশিখরসদৃশ সেই অনন্ত মোগল সেনাসাগরমধ্যে উদয়পুর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তসর্পশ্রেণীপরিবেষ্টিত গরুড়, যতটুকু শত্রুভীত হওয়ার সম্ভবানা, রাজসিংহ এই সাগরসদৃশ মোগলসেনা দেখিয়া ততটুকুই ভীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এরূপ সেনোদ্যোগ কুরুক্ষেত্রের পর হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। যে সেনা চীন, পারস্য বা রুষ জয়ের জন্যও আবশ্যক হয় না–ক্ষুদ্র উদয়পুর জয়ের জন্য ঔরঙ্গজেব বাদশাহ, তাহা রাজপুতানায় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একবার মাত্র পৃথিবীতে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি সের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্ম্মপলিতে Leonidas, সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল–শৃগাল কুক্কুরের মত সের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি–সেরের অপেক্ষাও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজা–রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন–রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।

যুদ্ধবিদ্যা, ইউরোপীয় বিদ্যা। আসিয়া খণ্ডে, ভারতবর্ষে ইহার বিকাশ কোন কালে নাই। যে পুরাণেতিহাসবর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। ইতিহাসলেখক ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যা কি, তাহা বুঝিতেন না বলিয়াই হৌক, আর যুদ্ধবিদ্যা বস্তুতঃ প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিল না বলিয়াই হৌক, রামচন্দ্র অর্জ্জুনাদির সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, শকাদিত্য, শিলাদিত্য–কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। যাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাসিম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন, বাবর, তৈমুর, নাদের, শের–কাহারও সেনাপতিত্বের কোন পরিচয় পাই না। বোধ হয়, মুসলমান লেখকেরাও ইহা বুঝিতেন না। আকব্বরের সময় হইতে এই সেনাপতিত্বের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আকব্বর, শিবজী, আহাম্মদ আবদালী, হৈদর আলি, হরিসিং প্রভৃতিতে সেনাপতিত্বের লক্ষণ, রণপাণ্ডিত্যের লক্ষণ দেখা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত রণপণ্ডিতের কথা আছে, রাজসিংহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। ইউরোপেও এরূপ রণপণ্ডিত অতি অল্পই জন্মিয়াছিল। অল্প সেনার সাহায্যে এরূপ মহৎ কার্য্য ওলন্দাজ বীর মুকাখ্য উইলিয়মের পর পৃথিবীতে আর কেহ করে নাই।

সে অপূর্ব্ব সেনাপতিত্বের পরিচয় দিবার এ স্থল নহে। সংক্ষেপে বলিব।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগতা হইলে, রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে, রাজ্যের যে অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতোপরি-আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। তিনি নিজ সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের কর্তৃত্বাধীনে পর্ব্বতশিখরে সংস্থাপিত করিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পুত্র ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমে সংস্থাপিত করিলেন; সে দিকের পথ খোলা থাকে, অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করেন, ইহাও অভিপ্রেত। নিজে তৃতীয় ভাগ লইয়া পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসঙ্কটমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ত পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল। আরোহণ করিবার সাধ্য নাই; উপর হইতে গোলা ও শিলাবৃষ্টি হয়। ক্রিয়াবাড়ীর দ্বার বন্ধ হইলে, কুকুর যেমন রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করে, কিছু করিতে পারে না, তিনি সেইরূপ পার্ব্বত্য দ্বার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন—ঢুকিতে পাইলেন না।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আকব্বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্ব্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সে দিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ, গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর একটি দয়েলবাবা; আর একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর, ঔরঙ্গজেব, আকব্বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে আগে যাইতে অনুমতি করিয়া উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির সংস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আকব্বর, পার্ব্বত্য পথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না। রাজপ্রাসাদমালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্য মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আকব্বর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন; মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগলশিবিরে আমোদ প্রমোদ হইতে লাগিল। কেহ ভোজনে, কেহ খেলায়, কেহ নেমাজে রত। এমন সময়ে সুপ্ত পথিকের উপর যেমন বাঘ লাফাইয়া পড়ে, কুমার জয়সিংহ তেমনই শাহজাদা আকব্বরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বাঘ প্রায় সমস্ত মোগলকে দুংষ্ট্রামধ্যে পুরিল—প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহাজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন।

মাজুম শাহ, যাঁহার নামান্তর শাহ আলম, তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া, আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পথ, গণরাও নামক পার্ব্বত্য পথ। তিনি সেই পথ উত্তীর্ণ হইয়া কাঁকরলির সমীপবর্ত্তী সরোবর ও রাজপ্রাসাদমালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতের পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, হাতে মারিলে যুদ্ধ হয় না—পেটে মারিতে হয়। যাঁহারা যথার্থ সেনাপতি, তাঁহারা জানেন যে, পেট চলিবার উপায় বজায় রাখিয়া—হাত চালান চাই। শিখেরা আজিও রোদন করিয়া বলে, শিখ সেনাপতিরা শিখসেনার রসদ বন্ধ করিল বলিয়া শিখ পরাজিত হইল। সার বার্টল্ ফ্রিয়র একদা বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না বলিয়া ঘৃণা করিও না—বাঙ্গালী একদিনে সমস্ত খাদ্য লুকাইতে পারে। শাহ আলম যুদ্ধ বুঝিতেন, সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে (এইটিই সেনাপতির প্রধান কার্য্য) বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা, বৃষ্টিকালে কপিদলের মত—কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মূলতানের সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ—দুনিয়াবাজ বাদশাহ আলম্‌গীর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আকব্বর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, মোগলদিগের দিল্লী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দিল্লী একটি বৃহৎ শিবির মাত্র। পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে মোগল বাদশাহদিগের শিবির একটি দিল্লী নগরী। নগরের যেমন চক, তেমনই বড় বড় চক সাজাইয়া তাম্বু পাতা হইত। এমন অসংখ্য চত্বরশ্রেণীতে একটি বস্ত্রনির্ম্মিতা মহানগরীর সৃষ্টি হইত। সকলের মধ্যে বাদশাহের তাম্বুর চক। দিল্লীতে যেমন মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে বাদশাহ বাস করিতেন, তেমনই মহার্ঘ হর্ম্ম্যশ্রেণীমধ্যে এখানেও বাস করিতেন; তেমনই দরবার, আমখাস, গোসলখানা,* রঙ্‌মহাল। এই সকল বাদশাহী তাম্বু কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত নহে। ইহার লৌহ পিত্তলের সজ্জা ছিল—এবং ইহাতে দ্বিতল ত্রিতল কক্ষও থাকিত। সম্মুখে দিল্লীর দুর্গের ফটকের ন্যায় বড় ফটক। বাদশাহী তাম্বু সকলের বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর বা পট পাদক্রোশ দীর্ঘ, সমস্তই চারু কারুকার্য্যখচিত পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত। যেমন দুর্গপ্রাচীরে বুরুজ গম্বুজ প্রভৃতি থাকিত, ইহাতে তাহা ছিল। পিত্তলের স্তম্ভের দ্বারা এই প্রাচীর রক্ষিত হইত। কক্ষসকলের বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা। ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি" মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র। দরবার তাম্বুতে শিরোপরে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—নিম্নে বিচিত্র গালিচা, মধ্যে রত্নমণ্ডিত রাজসিংহাসন। চারি দিকে অস্ত্রধারিণী তাতারসুন্দরীগণের প্রহরা।

রাজপ্রাসাদাবলীর পরে আমীর ওমরাহদিগের পটমণ্ডপরাজির শোভা। এমন শোভা অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া। কোন পটনির্ম্মিত অট্টালিকা রক্তবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি শ্বেত, কোনটি হরিৎকপিশ, কোনটি নীল, সকলের সুবর্ণকলস চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে ঝলসিতে থাকে। তীরে, এই সকলের চারিদিকে, দিল্লীর চকের ন্যায় বিচিত্র পণ্যবীথিকা—বাজারের পর বাজার। সহসা বাদশাহের শুভাগমনে উদয়সাগরতীরে এই রমণীয় মহানগরীর সৃষ্টি হইল। দেখিয়া লোক বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাদশাহ যখন শিবিরে আসিতেন, তখন অন্তঃপুরবাসিনী সকলেই সঙ্গে আসিত। বেগমেরা সকলেই আসিত। এবারও আসিয়াছিল। যোধপুরী, উদিপুরী, জেব-উন্নিসা সকলেই আসিয়াছিল। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল। দিল্লীর রঙ্‌মহালে যেমন তাহাদের পৃথক পৃথক মন্দির ছিল, শিবিরের রঙ্‌মহালেও তেমনই তাহাদের পৃথক পৃথক মন্দির ছিল।

এই সুখের শিবিরে, ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত।

"ইমলি বেগম!" বলিয়া বাদশাহ নির্ম্মলকে ডাকিলেন। নির্ম্মলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে "নিমলি বেগম" বলিতেন, কিন্তু বাক্যের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে "ইমলি বেগম" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ নির্ম্মলকে বলিলেন, "ইমলি বেগম! তুমি আমার, না রাজপুতের?" নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, "দুনিয়ার বাদশাহ দুনিয়ার বিচার করিতেছেন, এ কথারও তিনি বিচার করুন।"

ঔরঙ্গ। আমার বিচারে এই হইতেছে যে, তুমি রাজপুতের কন্যা, রাজপুত তোমার স্বামী, তুমি রাজপুতমহিষীর সখী—তুমি রাজপুতেরই।

---

* যাহাকে মোগল বাদশাহেরা গোসলখানা বলিতেন, তাহাতে, আধুনিক বৈঠকখানার মত কার্য্য হইত। সেইটি আয়েশেরাস্থান

নির্ম্মল। জাঁহাপনা! বিচার কি ঠিক হইল? আমি রাজপুতের কন্যা বটে, কিন্তু হজরৎ যোধপুরীও তাই। আপনার পিতামহী ও প্রপিতামহীও তাই–তাঁহারা মোগল বাদশাহের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না কি?

ঔরঙ্গ। ইহারা মোগল বাদশাহের বেগম, তুমি রাজপুতের স্ত্রী।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) আমি শাহান্‌শাহ, আলম্‌গীর বাদশাহের ইম্‌লি বেগম।

ঔরঙ্গ। তুমি রূপনগরীর সখী।

নির্ম্মল। যোধপুরীরও তাই।

ঔরঙ্গ। তবে তুমি আমার?

নির্ম্মল। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

ঔ। আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে। এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?

নি। কি কার্য্য, তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না। আমি কোন দেবতা ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে পারিব না।

ঔ। আমি তোমাকে সে সব কিছু করিতে বলিব না। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব–রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে।

নি। আমি আপনার নিকট গঙ্গাজী যমুনাজীর শপথ করিতেছি যে, আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল করেন, তবে আমি চঞ্চলকুমারীকে আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

ঔ। সে কথা বিশ্বাস করি; কেন না, তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাহাকে টুকরা টুকরা কাটিয়া কুকুরকে খাওয়াইতে পারি।

নি। পারেন কি না, সে বিষয়ে বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করিব না। তবে আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হাতে পড়িবার আগে চিতায় পুড়িয়া পুড়িয়া মরে। তাহাকে জীবিত পাইব না বলিয়াই এ কথা স্বীকার করিতেছি। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেশকার দরবারে হাজির, জরুরি আর্‌জি পেশ করিবে। হজরৎ শাহজাদা আকব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেশকার আরজি পেশ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আকব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগল সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে, কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আকব্বরের সংবাদ রঙ্‌মহালেও পৌঁছিল। শুনিয়া নির্ম্মলকুমারী পেশোয়াজ পরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোধপুরী বেগমের নিকট রূপনগরী নাচের মহলা দিল।

বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ভাল মানুষ হইয়া বসিলে বাদশাহ তাহাকে তলব করিলেন। নির্ম্মল হাজির হইলে বাদশাহ বলিলেন, "আমরা তাম্বু

ভাঙ্গিতেছি–লড়াইয়ে যাইব–তুমি কি এখন উদয়পুর যাইতে চাও?”

নি। না, এক্ষণে আমি ফৌজের সঙ্গে যাইব। যাইতে যাইতে যেখানে সুবিধা বুঝিব সেইখানে হইতে চলিয়া যাইব।

ঔরঙ্গজেব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন, “কেন যাইবে?”

নির্ম্মল বলিল, “শাহান্‌শাহের হুকুম।”

ঔরঙ্গজেব প্রফুল্লভাবে বলিলেন, “আমি যদি যাইতে না দিই, তুমি কি চিরদিন আমার রঙ্‌মহালে থাকিতে সম্মত হইবে?”

নির্ম্মলকুমারী যুক্তকরে বলিল, “আমার স্বামী আছেন।”

ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “যদি তুমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর–যদি সে স্বামী ত্যাগ কর–তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।”

নির্ম্মল একটু হাসিয়া, অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, “তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!”

ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুতরাজকন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে।

নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই।

ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে?

নি। এ কথা কেন?

ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখন কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়–পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়–একটু স্নিগ্ধ হয়।

নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাস করিল–কেন না, ঔরঙ্গজেবের কণ্ঠের স্বর বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল। নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল, “জাঁহাপনা, এ বাঁদী এমন কি কাজ করিয়াছে যে, সে আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়?”

ঔ। তাহা বলিতে পারি না। তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। যাই হৌক, আলম্‌গীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও কখন বশীভূত হয় নাই। আর কাহারও চক্ষুর কটাক্ষে মোহিত হয় নাই।

নি। শাহান্‌শাহ! আমাকে একদা রূপনগরের রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর? আমি বলিয়াছিলাম, আলম্‌গীর বাদশাহকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমি বাল্যকালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাইতে আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী। এক্ষণে আমায় বিদায় দিন।

ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না–কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি–কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না–ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব।

যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্বরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার কোন উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।”

নির্ম্মল কুর্ণিশ করিল। বলিল, “আমার একটি মাত্র ভিক্ষা রহিল। যখন উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।”

ঔরঙ্গজেব বলিল, “সে কথার বিচার সেই সময়ে হইবে।”

তখন নির্ম্মল ঔরঙ্গজেবকে তাহার কপোত দেখাইল। বলিল, “এই শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গে রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক।”

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্য চালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলের মত কথোপকথনে সাহস, বাকচাতুর্য্য এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব মোগল বাদশাহ আর কোথাও দেখেন নাই। যদি কোন রাজা–শিবজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি–দিলীর কি তয়বার, যদি কোন শাহজাদা–আজিম কি আকব্বর, এরূপ সাহসে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরঙ্গজেব তাহা সহ্য করিতেন না। কিন্তু রূপবতী যুবতী সহায়হীনা নির্ম্মলের কাছে তাহা মিষ্ট লাগিত। বুড়ার উপর যতটুকু কন্দর্পের অত্যাচার হইতে পারে, বোধ হয় তাহা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব প্রেমান্ধের মত বিচ্ছেদে শোকে শোকাকুল না হইয়া একটু বিষণ্ন হইলেন মাত্র। ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাগ্রে পথপরিষ্কারক সৈন্য পথ পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র, কোদালি, কুড়ালি, দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছ সকল কাটিয়া, সরাইয়া খানা পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী, শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়ু ঘড়ু হড়ু হড়ু করিয়া চলিল,–সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়ু ঘড়ু শব্দে কর্ণ বধির,–তাহার চক্রসহস্র হইতে বিঘূর্ণিত ঊর্দ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামানসকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজকোষাগার। বাদশাহী কোষাগার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; দিল্লীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ঔরঙ্গজেব ধনরাশি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যশাসনে মূলমন্ত্র সর্ব্বজনে অবিশ্বাস। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এইবার দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ঔরঙ্গজেব আর কখন দিল্লী ফিরিলেন না। শতাব্দীর একপাদ শিবিরে শিবিরে ফিরিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্ত ধনরত্নরাজিপরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজকোষের পর, বাদশাহী দফ্‌তরখানা চলিল। থাকে থাকে থাকে, গাড়ি, হাতী, উটের উপর সাজান খাতাপত্র বহিজাত; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী; অসংখ্য, অনন্ত চলিতে লাগিল। তার পর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে; তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্দ্ধেক গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য–আটা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ–প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, পক্ক, অপক্ক, ভক্ষ্য চলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবুর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা–এল্‌বাস পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি; তার পর অগণনীয়

অশ্বারোহী মোগল সেনা।

এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জ্বলন্ত বহ্নিবাহী বৃহৎ কটাহসকলে, ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস আহদী সেনা, দোষশূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্নকিঙ্কিণীজালাদি শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরুঢ়–শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতছত্র। তার পর সৈন্যের সার, দিল্লীর সার, বাদশাহীর সার, ঔরঙ্গজেবের অবরোধবাসিনী সুন্দরীসম্প্রদায়। কেহ বা ঐরাবততুল্য গজপৃষ্ঠে, সুবর্ণনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মখ্‌মলে মোড়া, মুক্তাঝালরভূষিত, অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তুতুল্য রেশমী বস্ত্রে আবৃত, হাওদার ভিতরে, অতি ক্ষীণমেঘাবৃত উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রতুল্য জ্বলিতেছে–রত্নমালাজড়িত কালভুজঙ্গীতুল্য, বেণী পৃষ্ঠে দুলিতেছে –কুষ্ণতার বৃহক্ষুর মধ্যে কালাগ্নিতুল্য কটাক্ষ খেলিতেছে; উপরে কালো ভ্রূযুগ, নীচে সুর্‌মার রেখা, তাহার মধ্যে সেই বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরণে, সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; মধুর তাম্বূলারক্ত অধরে মাধুর্যময়ী সুন্দরীকুল মধুর মধুর হাসিতেছে। এমন এক জন নয়, দুই জন নয়,–হাতীর গায়ে হাতী, হাতীর পিছু হাতী, তার পিছু হাতী। সকলের উপরেই তেমনই হাওদা, সকল হাওদার ভিতর তেমনই সুন্দরী, সকল সুন্দরীর নয়নেই মেঘযুগলমধ্যস্থ বিদ্যুদ্দামের ক্রীড়া! কালো পৃথিবী আলো হইয়া গেল। কেহ বা কদাচিৎ দোলায় চলিল–দোলার বাহিরে কিংখাপ, ভিতরে জরদোজী কামদার মখমল, উপরে মুক্তার ঝালর, রূপার দাণ্ডা, সোণার হাঙ্গর–তাহার ভিতরে রত্নমণ্ডিতা সুন্দরী। যোধপুরী ও নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা, ইহারা গজপৃষ্ঠে। উদিপুরী হাস্যময়ী। যোধপুরী অপ্রসন্না। নির্ম্মলকুমারী রহস্যময়ী। জেব-উন্নিসা, গ্রীষ্মকালে উন্মূলিতা লতার মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, পরিশুষ্ক, শীর্ণ, মৃতকল্প। জেব-উন্নিসা ভাবিতেছে, "এ হাতিয়ার লহরীমাঝে আমার ডুবিয়া মরিবার কি উপায় নাই?"

এই মনোমোহিনী বাহিনীর পশ্চাৎ কুটুম্বিনী ও দাসীবৃন্দ। সকলেই অশ্বারূঢ়া, লম্বিতবেণী, রক্তাধরা, বিদ্যুৎকটাক্ষা; অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঘোড়া সকল নাচিয়া উঠিতেছে। এই অশ্বারোহিণী বাহিনীও অতিশয় লোকমনোমোহিনী। ইহাদের পশ্চাতে আবার গোলন্দাজ সেনা–কিন্তু ইহাদের কামান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাদশাহ বুঝি স্থির করিয়াছিলেন, কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় কামানের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় ভাগে পদাতি সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাস দাসী, মুটে মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বুর রাশি এবং মোট ঘাট।

যেমন ঘোরনাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া–তিমি মকর আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী, বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী, ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহাকোলাহলে মহাবেগে এই পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া, বিস্ময়াকরী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে পথে আকব্বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আকব্বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুই জনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আকব্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া আমিষলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই গরিসানুদেশে সসৈন্য উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মোগল দেখিল, রাজসিংহের এই অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেন না, মোগলেরা যে পথে যাইতেছিল, সে পথে আর চলিলে রাজসিংহকে পার্শ্বে রাখিয়া যাইতে হয়। শত্রুসৈন্যকে পার্শ্বে রাখিয়া যাওয়ার অপেক্ষা বিপদ্ অল্পই আছে। পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ করে, তাহাকে রণে বিমুখ

করা যায় না, সেই জয়ী হইয়া বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। সালামাঙ্কা ও ঔস্তরলিজে ইহাই ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও এ স্বতঃসিদ্ধ রণতত্ত্ব জানিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, পার্শ্বস্থিত, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাই করিতে গেলে নিজ সৈন্যকে ফিরাইয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করিতে হয়। এই পার্ব্বত্য পথে তাদৃশ মহতী সেনা ফিরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবং সময়ও পাওয়া যাইবে না। কেন না, সেনার মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে রাজসিংহ পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, এক এক খণ্ড পৃথক করিয়া বিনষ্ট করিতে পারেন। এরূপ যুদ্ধে সাহস করা অকর্ত্তব্য। তার পর এমন হইতে পারে, রাজসিংহ যুদ্ধ না করিতেও পারেন। নির্ব্বিঘ্নে ঔরঙ্গজেবকে যাইতে দিতেও পারেন। তাহা হইলে আরও বিপদ্। তাহা হইলে ঔরঙ্গজেব চলিয়া গেলে রাজসিংহ পর্ব্বতাবতরণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের পশ্চাদগামী হইবেন। হইলে, তিনি যে মোগলের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাল, আসবাব লুঠপাট ও সেনাধ্বংস করিবেন, সেও ক্ষুদ্র কথা। আসল কথা, রসদের পথ বন্ধ হইবে। সম্মুখে কুমার জয়সিংহের সেনা। রাজসিংহের সেনা ও জয়সিংহের সেনা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া, ফাঁদের ভিতর প্রবিষ্ট মূষিকের মত, দিল্লীর বাদশাহ সসৈন্য নিহত হইবেন।

ফলে দিল্লীশ্বরের অবস্থা জালনিবদ্ধ রোহিতের মত—কোন মতেই নিস্তার নাই। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে রাজসিংহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন। তিনি উদয়পুরের রাজ্য অতল জলে ডুবাইতে আসিয়াছিলেন—সে কথা দূরে থাকুক, এখন উদয়পুরের রাজা, তাঁহার পশ্চাৎ করতালি দিতে দিতে ছুটিবে— পৃথিবী হাসিবে। মোগল বাদশাহের অপরিমিত গৌরবের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন—সিংহ হইয়া মূষিকের ভয়ে পলাইব? কিছুতেই পলায়নের কথাকে মনে স্থান দিলেন না।

তখন আর কি হইতে পারে? এক মাত্র ভরসা—উদয়পুরের যাইবার যদি অন্য কোন পথ থাকে। ঔরঙ্গজেবের আদেশে চারি দিকে অশ্বারোহী পদাতি অন্য পথের সন্ধানে ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি পরদানশীন স্ত্রীলোক—পথের কথা আমি কি জানি?" কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সংবাদ আসিল যে, উদয়পুরে যাইবার আর একটা পথ আছে। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে। একজন মন্‌সবদার সে পথ দেখিয়া আসিয়াছে। সে একটি পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথ; অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বাহির হওয়া যাইবে। সে দিকে কোন রাজপুত দেখা যাইতেছে না। যে মোগল সংবাদ দিয়াছে, সে বলিতেছে যে, সে দিকে কোন রাজপুত সেনা নাই।

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন। বলিলেন, "নাই, কিন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে।"

যে মনসবদার পথ দেখিয়া আসিয়াছিল—বখ্‌ত খাঁ—সে বলিল যে, "যে মোগল আমাকে প্রথমেই এই পথের সন্ধান দেয়, তাহাকে আমি পর্ব্বতের উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি। সে যদি রাজপুত সেনা দেখিতে পায়, তবে আমাকে সঙ্কেত করিবে।"

ঔরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আমার সিপাহী?"

বখ্‌ত খাঁ। না, সে একজন সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচিতে গিয়াছিল। এখন শিবিরে বেচিতে আসিয়াছিল।

ঔরঙ্গ। ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ লইয়া যাও।

তখন বাদশাহী হুকুমে, ফৌজ ফিরিল। ফিরিল—কেন না, কিছু পথ ফিরিয়া আসিয়া তবে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতেও বিশেষ বিপদ—তবে জালনিবদ্ধ বৃহৎ রোহিত আর কোন্ দিকে যায়? যেরূপ পারম্পর্য্যের সহিত মোগলসেনা আসিয়াছিল—তাহা আর রক্ষিত হইতে পারিল না। যে ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল; যাহা পিছনে ছিল, তাহা আগে চলিল। সেনার তৃতীয় ভাগ আগে আগে চলিল। বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, তাম্বু ও মোট ঘাট ও বাজে লোক সকল এক্ষণে উদয়সাগরের পথে যাক্—পরে সেনার পশ্চাতে তাহারা আসিবে। তাহাই হইল। ঔরঙ্গজেব নিজে, পদাতি ও ছোট কামান ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া

রন্ধ্রপথে চলিলেন। আগে আগে বখ্‌ত খাঁ।

দেখিয়া, রাজসিংহ, সিংহের মত লাফ দিয়া, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগল সেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগল সেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্ট; আর এক ভাগ, এখন পূর্ব্বপথে, কিন্তু রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কালভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে সকল আহদীয়ান্ তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমেরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরীবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের নিকটে নিকটে থাকেন—তিনি রাজসিংহের অতিশয় প্রিয়। মাণিকলাল আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এখন এই মার্জ্জারী সম্প্রদায় লইয়া কি করা যায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পুরিয়া দধিদুগ্ধ ভোজনের জন্য ইহাদের উদয়পুরে পাঠাইয়া দিই।"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এত দই দুধ উদয়পুরে নাই। শুনিয়াছি, দিল্লীর মার্জ্জারীদের পেট মোটা। কেবল উদিপুরীকে মহিষী চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠাইয়া দাও। তিনি ইহার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর সব ঔরঙ্গজেবের ধন ঔরঙ্গজেবকে ফিরাইয়া দাও।"

মাণিকলাল জোড়হাতে বলিল, "লুঠের সামগ্রী সৈনিকেরা কিছু কিছু পাইয়া থাকে।"

রাজসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার কাহাকেও প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মুসলমানী, হিন্দুর অস্পর্শীয়া।"

মাণিক। উহারা নাচিতে গায়িতে জানে।

রাজ। নাচ গানে মন দিলে, রাজপুত কি আর তোমাদিগের মত বীরপনা দেখাইতে পারিবে? সব ছাড়িয়া দাও। উদিপুরীকে কেবল উদয়পুরে পাঠাইয়া দাও।

মাণিক। এ সমুদ্রমধ্যে সে রত্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আমার ত চেনা নাই। যদি আজ্ঞা হয়, তবে হনুমানের মত, এ গন্ধমাদন লইয়া গিয়া মহিষীর কাছে উপস্থিত করি। তিনি বাছিয়া লইবেন। যাহাকে রাখিতে হয়, রাখিবেন, বাকিগুলা ছাড়িয়া দিবেন। তাহারা উদয়পুরের বাজারে সুর্‌মা মিশি বেচিয়া দিনপাত করিবে।

এমন সময়ে মহাগজপৃষ্ঠ হইতে নির্ম্মলকুমারী রাজসিংহ ও মাণিকলাল উভয়কে দেখিতে পাইল। করযুগল উত্তোলন করিয়া সে উভয়কে প্রণাম করিল। দেখিয়া রাজসিংহ মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কোন্ বেগম? হিন্দু বোধ হইতেছে—সেলাম না করিয়া, আমাদের প্রণাম করিল।"

মাণিকলাল দেখিয়া উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! ও একটা বাঁদী—ওটা বেগম হইল কি প্রকারে? উহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে।"

এই বলিয়া মাণিকলাল হুকুম দিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে হাতীর উপর হইতে নামাইয়া আপনার নিকট আনাইল। নির্ম্মল কথা না কহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি? তুমি বেগম হইলে কবে?"

নির্ম্মল, মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "মেয়্‌নে হজরৎ ইম্‌লি বেগম। তস্‌লিম দে।"

মাণিকলাল। তা না হয় দিতেছি—বেগম ত তুমি নও জানি; তোমার বাপ দাদাও কখনও বেগম হয় নাই—কিন্তু এ বেশ কেন?

নির্ম্মল। পহেলা মেরা হুকুম তামিল কর্—বাজে বাত আব্‌হি রাখ্।

মাণিকলাল। সীতারাম! বেগম সাহেবার ধমক দেখ!

নির্ম্মল। হামারি হুকুম যেহি হৈ কি হজরৎ উদিপুরী বেগম সাহেবা সামনেকা পঞ্চকলস্‌দার হাওদাওয়ালে হাতিপর তশরিফ রাখ্‌তী হেঁই। উন্‌কো হামারা হুজুম মে হাজির কর্‌।

বলিতে বিলম্ব সহিল না–মাণিকলাল তখনই উদিপুরীকে হাতী হইতে নামাইতে বলিল। উদিপুরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নামিল। মাণিকলাল একখানা দোলা খালি করিয়া, সে দোলা উদিপুরীর হাতীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দোলায় চড়াইয়া উদিপুরীকে লইয়া আসিল। তার পর মাণিকলাল, নির্ম্মলকুমারীকে কাণে কাণে বলিল, “জী হাম্‌লী বেগম সাহেবা! আর একটা কথা–”

নির্ম্মল। চুপ্‌ রহ, বেতমিজ! মেরে নাম হজরৎ ইম্‌লি বেগম।

মাণিক। আচ্ছা, যে বেগমই হও না কেন, জেব-উন্নিসা বেগমকে চেন?

নির্ম্মল। জানতে নেহিন? বহু হামারি বেটী লাগ্‌তী হৈ। দেখ, আগাড়ী সোনেকা তিন কলস যো হাওদে পর জলুষ দেতা হ্যায়, বস্‌পর জেব-উন্নিসা বৈঠী হৈ।

মাণিকলাল তাঁহাকেও হাতী হইতে নামাইয়া দোলায় তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

সেই সময়ে আবার কোন মহিষী হাওদার জরির পরদা টানিয়া মুখ বাহির করিয়া, নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিল। মাণিকলাল নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আবার তোমাকে কে ডাকিতেছে না?”

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, “হাঁ। যোধপুরী বেগম। কিন্তু উঁহাকে এখানে আনা হইবে না। আমাকে হাতীর উপর চড়াইয়া উঁহার কাছে লইয়া চল। শুনিয়া আসি।”

মাণিকলাল তাহাই করিল। নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর হাতীর উপর উঠিয়া তাঁহার ইন্দ্রাসনতুল্য হাওদার ভিতরে প্রবেশ করিল। যোধপুরী বলিলেন, “আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল।”

নির্ম্মল। কেন মা?

যোধপুরী। কেন, তা ত কতবার বলিয়াছি। আমি এ ম্লেচ্ছপুরীতে, এ মহাপাপের ভিতর আর থাকিতে পারি না।

নির্ম্মল। তাহা হইবে না। তোমার যাওয়া হইবে না। আজ যদি মোগল সাম্রাজ্য টিকে, তবে তোমার ছেলে দিল্লীর বাদশাহ হইবে। আমরা সেই চেষ্টা করিব। তাঁর রাজত্বে আমরা সুখে থাকিব।

যোধপুরী। অমন কথা মুখে আনিও না,বাছা! বাদশাহ শুনিলে, আমার ছেলে এক দিনও বাঁচিবে না। বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণ যাইবে।

নির্ম্মল। এখনকার কথা বলিতেছি না। যাহা শাহজাদার হক্‌ কালে তিনি পাইবেন। আপনি আমাকে আর কোন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি যদি আমার সঙ্গে এখন যান, আপনার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

যোধপুরী ভাবিয়া বলিল, “সে কথা সত্য। তোমার কথাই শুনিলাম। আমি যাইব না। তুমি যাও।”

নির্ম্মলকুমারী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্যে বেষ্টিতা হইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

তখন রাজসিংহ আর সকল পৌরাঙ্গনাগণকে—গজারূঢ়া, শিবিকারূঢ়া এবং অশ্বারূঢ়া—সকলকেই, ঔরঙ্গজেবকে যে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিতে দিলেন। তাহারা প্রবেশ করিলে পর, উভয় সেনা নিস্তব্ধ হইল। ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—কেন না, রাজসিংহ পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সাগরতুল্য অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। তাহারা ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া রাজপুতের সম্মুখীন হইল। তখন রাজসিংহ একটু হঠিয়া গিয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন—তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা "দীন দীন" শব্দ করিতে করিতে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে, বাদশাহ যে সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রবেশ করিল। রাজসিংহ আবার আগু হইলেন।

তার পর বাদশাহী তোষাখানা আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্ষক নাই বলিলেই হয়, রাজপুতেরা তাহা লুঠিয়া লইল। তার পর খাদ্যদ্রব্য। যাহা হিন্দুর ব্যবহার্য্য, তাহা রাজসিংহের রসদের সামিল হইল। যাহা হিন্দুর অব্যবহার্য্য, তাহা ডোম দোসাদে লইয়া গিয়া কতক খাইল, কতক পর্ব্বতে ছড়াইল—শৃগাল-কুক্কুর এবং বন্য পশুতে খাইল। রাজপুতেরা দফ্‌তরখানা হাতীর উপর হইতে নামাইল—কতক বা পুড়াইয়া দিল, কতক বা ছাড়িয়া দিল। তার পর মালখানা; তাহাতে যে ধনরত্নরাশি আছে, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও নাই—জানিয়া রাজপুত সেনাপতিগণ লোভে উন্মত্ত হইল। তাহার পশ্চাতে বড় গোলন্দাজ সেনা। রাজসিংহ আপন সেনা সংযত করিলেন। বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। ও সব তোমাদেরই। আজ ছাড়িয়া দাও। আজ এখন যুদ্ধের সময় নহে।" রাজসিংহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

তার পর মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এতটা সুবিধা হইবে, আমি মনে করি নাই। আমি যাহা অভিপ্রেত করিয়াছিলাম, তাহাতে যুদ্ধ করিয়া মোগলকে বিনষ্ট করিতে হইত। এক্ষণে বিনা যুদ্ধেই মোগলকে বিনষ্ট করিতে পারিব। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাহার বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব তাহাকে নিজসেনা মধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। তাহাতে মবারক কিছু দুঃখিত ছিল। আজ সেই দুঃখে গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিল। সে গুরুতর কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, মবারকই ছদ্মবেশী মোগল সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া মবারককে লইয়া আসিলেন। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "তুমি এই সাহস ও চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, মোগল সওদাগর সাজিয়া, মোগল সেনা রন্ধ্রপথে না লইয়া গেলে অনেক প্রাণিহত্যা হইত। তোমাকে কেহ চিনিতে পারিলে তোমারও মহাবিপদ উপস্থিত হইত।"

মবারক বলিল, "মহারাজ! যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে মরিয়াছে, যাহাকে সকলের সমক্ষে গোর দিয়াছে, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেও চেনে না—মনে করে, ভ্রম হইতেছে। আমি এই সাহসেই গিয়াছিলাম।"

রাজসিংহ বলিলেন, "এক্ষণে যদি আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সে আমার দোষ। তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

মবারক কহিল, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হৌক! আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য

স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যদি এ কাজে তোমার এতই কষ্ট, তবে এমন কাজ কেন করিলে? আমাকে জানইলে না কেন? আমি অন্য লোক নিযুক্ত করিতাম। আমি কাহাকেও এত দূর মনঃপীড়া দিতে চাহি না।"

মবারক, মাণিকলালকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এ মহাত্মা আমার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিতান্ত অনুরোধ যে, আমি এই কার্য্য সিদ্ধ করি। আমি নহিলেও এ কাজ সিদ্ধ হইত না; কেন না, মোগল ভিন্ন হিন্দুকে মোগলেরা বিশ্বাস করিত না। আমি ইহা অস্বীকার করিলে অকৃতজ্ঞতা পাপে পড়িতাম। তাই এ কাজ করিয়াছি। এক্ষণে এ প্রাণ আর রক্ষা করিব না স্থির করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে আদেশ করুন। অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকটে পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

রাজসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "কাল তোমাকে আমি মোগল সেনায় প্রবেশের অনুমতি দিব। আর একদিন মাত্র থাক। আমার কেবল এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। ঔরঙ্গজেব তোমাকে বধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক। তাহা মহারাজের সাক্ষাৎ বক্তব্য নহে।

রাজসিংহ। মাণিকলালের সাক্ষাৎ ?

মবারক। বলিয়াছি।

রাজসিংহ। আর একদিন অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া রাজসিংহ মবারককে বিদায় দিলেন।

তার পর, মাণিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব! যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন?"

মবারক বলিল, "ভুল! সিংহজী ভুল! আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে শয়তানী আমার ভালবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি–এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমর কি? আমি আর কিছুই দেখিতে আসিব না।"

মাণিকলাল। জেব-উন্নিসাকে রাখিতে যদি আপনি অনুমতি না করেন, তবে আমি বাদশাহের নিকট কিছু ঘুষ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।

মবারক। আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে, জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কি না? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে?

মাণিকলাল। তবে আপনি এখনও তাহার প্রতি অনুরক্ত?

মবারক। কিছুমাত্র না। একবার দেখিব মাত্র। আপনার কাছে এই পর্য্যন্ত ভিক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল?

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। কিন্তু রন্ধ্রের অপর মুখের কেহই পৌঁছিল না। অপর মুখের কোন সংবাদ নাই। সন্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহের ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল–কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্য তলভূমি, বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টক্কর খাইতে লাগিল। কত ঘোড়া আরোহীসমেত পড়িয়া গেল; অপর অশ্বের পাদদলনে পিষ্ট হইয়া অশ্ব ও আরোহী উভয়ে আহত বা নিহত হইল। কত হাতীর পায়ে বড় বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল–হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল। অশ্বারোহিণী স্ত্রীগণ, ভূপতিতা হইয়া অশ্বপদে, হস্তিপদে দলিত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। দোলার বাহকদিগের চরণ সকল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। পদাতিক সেনা আর চলিতে পারে না–পদস্খলনে এবং উপলাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইল। তখন ঔরঙ্গজেব রাত্রিতে সেনার গতি বন্ধ করিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

কিন্তু তাম্বু ফেলিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে বাদশাহ ও বেগমদিগের তাম্বুর স্থান হইল। আর কাহারও হইল না। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে রহিল। অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে–গজারোহী গজপৃষ্ঠে–পদাতিক চরণে ভর করিয়া রহিল। কেহ বা কষ্টে পর্ব্বতসানুদেশে একটু স্থান করিয়া, তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সানুদেশ দুরারোহণীয়,–এমন খাড়া যে, উঠা যায় না। অধিকাংশ লোকই এরূপ বিশ্রামের স্থান পাইল না।

তার পর বিপদের উপর বিপদ–খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে যাহা ছিল, তাহা ত রাজপুতেরা লুঠিয়া লইয়াছে। যে রন্ধ্রপথে সেনা উপস্থিত–সেখানে অন্য খাদ্যের কথা দূরে থাক, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কিছু খাইতে পাইল না, বাদশাহ কি বেগমেরাও নয়। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল। মোগল সেনা বড় গোলযোগে পড়িল।

এ দিকে বাদশাহ উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। একা সমস্ত সৈনিকদিগকে নিহত করা যায় না, নহিলে ঔরঙ্গজেব তাহা করিতেন। বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ, সিংহীকে পিঞ্জারবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতি দূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক শব্দ মনে করিয়া, সকলে চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রি প্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা,-তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী-অতি দ্রুতপদে রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট-বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা-সকলে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া উদয়পুর নিঃশেষে ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন-তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগল সেনা রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ! রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে রন্ধ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে-পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন বৃক্ষরাশি রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী অশ্ব পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল-কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল-স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া, ঔরঙ্গজেবের পাষাণনির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

সৈন্যের পথপরিষ্কারক সম্প্রদায় অগ্রে থাকে, কিন্তু এই সৈন্যকে বিপরীত গতিতে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাতে ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্মুখে আনিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু তাহাদের আসা কালবিলম্বের কথা। তাহাদের অপেক্ষা করিতে গেলে হয় ত সে দিনও উপবাসে কাটিবে। অতএব ঔরঙ্গজেব হুকুম দিলেন যে, পদাতিক সৈন্য, এবং অন্য যে পারে, বহু লোকে একত্র হইয়া, গাছের প্রাচীরের উপর চড়িয়া, গাছ সকল ঠেলিয়া পাশে ফেলিয়া দেয়, এবং এই পরিশ্রমের সাহায্য জন্য হস্তীসকলকে নিযুক্ত করিলেন। অতএব সহস্র সহস্র পদাতিক এবং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রাকার ভগ্ন করিতে ছুটিল। কিন্তু যখন এ সকল, বৃক্ষপ্রাকারমূলে সমবেত হইল, তখন অমনই গিরিশিখর হইতে, যেমন ফাল্গুনের বাত্যায় শিলাবৃষ্টি হয়, তেমনই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। পদাতিক সকলের মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও কক্ষ, কাহারও বক্ষ চূর্ণীকৃত হইল-কাহারও বা সমস্ত শরীর কর্দ্দমপিণ্ডবৎ হইয়া গেল। হস্তীসকলের মধ্যে কাহারও কুম্ভ, কাহারও দন্ত, কাহারও মেরুদণ্ড, কাহারও পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গেল; হস্তী সকল বিকট চীৎকার করিতে করিতে, পদাতিক সৈন্য পদতলে বিদলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সেনা বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র সহস্র রাজপুত পদাতিক পিপীলিকার মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের বন্দুকের গুলিতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

শুনিয়া ওরঙ্গজেব সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষপ্রাচীরভঙ্গের উদ্যম করিতে আদেশ করিলেন। তখন "দীন্ দীন" শব্দ করিয়া মোগল সেনা আবার ছুটিল-আবার রাজপুতসেনাকৃত গুলির বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে বাত্যা সমীপে ইক্ষুক্ষেত্রের ইক্ষুর মত ভূমিশায়ী হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উদ্যম করিয়া মোগল সেনা দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া, সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধ্রপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। সমস্ত সেনা ক্ষুৎপিপাসায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন, ঔরঙ্গজেবও তাঁহার জন্মে এই প্রথম ক্ষুৎপিপাসায় অধীর; বেগমরাও তাই। কিন্তু আর উপায়ন্তর নাই-পর্ব্বতের সানুদেশ আরোহণ করা যায় না; কেন না, পাহাড় সোজা উঠিয়াছে। কাজেই ফিরিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে, যে মুখে ঔরঙ্গজেব সসৈন্য রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পুনশ্চ রন্ধ্রের সেই মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানেও প্রত্যক্ষমূর্ত্তি মৃত্যু, তাঁহাকে সসৈন্যে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রন্ধ্রের সে মুখও, সেইরূপ অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রাকারে বন্ধ; নির্গমের উপায় নাই। পর্ব্বতোপরি রাজপুতসেনা পূর্ব্ববৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু নির্গত না হইলে ত নিশ্চিত সসৈন্য মৃত্যু। অতএব সমস্ত মোগল সেনাপতিকে ডাকিয়া ঔরঙ্গজেব স্তুতি মিনতি, উৎসাহবাক্য এবং ভয়প্রদর্শনের দ্বারা

পথ মুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পতন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। সেনাপতিগণ সেনা লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। এবার একটু সুবিধাও ছিল–পথপরিষ্কারক সেনাও উপস্থিত ছিল। মোগলেরা মরণ তৃণজ্ঞান করিয়া বৃক্ষরাজি ছিন্ন ও আকৃষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র। পর্ব্বতশিখর হইতে যে লৌহ ও পাষাণবৃষ্টি হইতেছিল–ভাদ্রের বর্ষায় যেমন ধান্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, মোগল সেনা তাহাতে তেমনই ডুবিয়া গেল।

তার পর বিপদের উপর বিপদ্, সম্মুখস্থ পর্ব্বতসানুদেশে রাজসিংহের শিবির। তিনি দূর হইতে মোগল সেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল–হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগল সেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া, ক্রূর সর্প যেমন অগ্নিভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগল সেনা রন্ধ্রবিবরে সেইরূপ লুকাইল। শাহান্‌শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্ব্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত ভুঁইঞার নিকট সসৈন্য পিঞ্জরাবদ্ধ মূষিক। একটা মূষিকের আহার পাইলেও আপাততঃ তাঁর প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

তখন ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উদিপুরীর দাহনারম্ভ

নির্ম্মলকুমারী, উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন। উদিপুরী আসিলে তাঁহাকে পৃথক আসনে বসিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উদিপুরী অত্যন্ত বিষণ্ন ও বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চঞ্চলকুমারীর সৌজন্য দেখিয়া মনে করিলেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ হিন্দু ভয়েই এত সৌজন্য করিতেছে। তখন ম্লেচ্ছকন্যা বলিল, "তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু বাসনা করিতেছ কেন?"

চঞ্চলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমরা তাঁহার নিকট মৃত্যু কামনা করি নাই। তিনি যদি সে সামগ্রী আমাদিগকে দিতে পারেন, সেই আশায় আসিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা হিন্দু; যবনের দান গ্রহণ করি না।"

উদিপুরী ঘৃণার সহিত বলিল, "উদয়পুরের ভুঁইঞারা পুরুষানুক্রমে মুসলমানের কাছে এ দান স্বীকার করিয়াছেন। সুলতান্ আলাউদ্দীনের কথা ছাড়িয়া দিই; মোগল বাদশাহ আকব্বর শাহ, এবং তাঁহার পৌত্রের নিকটও রাণা রাজসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা এ দান স্বীকার করিয়াছেন।"

চঞ্চল। বেগম সাহেব! আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, সে আমরা দান বলিয়া স্বীকার করি নাই; ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আকব্বর বাদশাহের ঋণ, প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। আপনার শ্বশুরের ঋণ এক্ষণে আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার প্রথম কিস্তি লইবার জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি। আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

চঞ্চলকুমারী প্রথমে বেগমের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বেগম যদি তাহার উপযোগী ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহাকে এ অপমানে পড়িতে হইত না। কিন্তু তিনি পুরুষবাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চলকুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত করিয়াছেন–কাজেই এখন ফলভোগ করিতে হইল। তামাকু সাজার কথায়, সেই তামাকু সাজার নিমন্ত্রপত্রখানা মনে পড়িল। উদিপুরীর সর্ব্বশরীরে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তথাপি অভ্যস্ত গর্ব্বকে হৃদয়ে পুনঃ স্থাপন করিয়া

কহিলেন, “বাদশাহের বেগমে তামাকু সাজে না।”

চঞ্চলকুমারী। যখন তুমি বাদশাহের বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজিতে না। এখন তুমি আমার বাঁদী। তামাকু সাজিবে। আমার হুকুম।

উদিপুরী কাঁদিয়া ফেলিল–দুঃখে নহে; রাগে। বলিল, “তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলম্‌গীর বাদশাহের বেগমকে তামাকু সাজিতে বল?”

চঞ্চল। আমার ভরসা আছে, কাল আলম্‌গীর বাদশাহ স্বয়ং এখানে আসিয়া মহারাণার তামাকু সাজিবেন। তাঁহার যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁহাকে কাল শিখাইয়া দিবে। আজ আপনি শিখিয়া রাখ।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, “ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।”

উদিপুরী উঠে না।

তখন পরিচারিকা বলিল, “ছিলিম উঠাও।”

উদিপুরী তথাপি উঠিল না। তখন পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে, কম্পিতহৃদয়ে শাহন্‌শাহের প্রেয়সী মহিষী ছিলিম তুলিতে গেলেন। তখন ছিলিম পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন না। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থর থর করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা ধরিয়া ফেলিল–আঘাত লাগিল না। উদিপুরী হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ পালঙ্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘ শয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহীত শুশ্রূষা করিল। অল্প সময়েই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, আর কেহ কোন প্রকারে বেগমের অসম্মান না করে। আহারাদি, শয়ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে চঞ্চলকুমারীর নিজের যেরূপ বন্দোবস্ত, বেগম সম্বন্ধে ততোধিক যাহাতে হয় তাহা করিতে চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারীকে আদেশ করিলেন।

নির্ম্মল বলিল, “তাহা সবই হইবে। কিন্তু তাহাতে ইঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না।”

চঞ্চল। কেন, আর কি চাই?

নির্ম্মল। তাহা রাজপুরীতে অপ্রাপ্য।

চঞ্চল। শরাব? যখন তাহা চাহিবে, তখন একটু গোময় দিও।

উদিপুরী পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, উদিপুরী নির্ম্মলকুমারীকে ডাকাইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, “ইম্‌লি বেগম–থোড়া শরাব হুকুম কি জিয়ে।”

নির্ম্মল “দিতেছি” বলিয়া রাজবৈদ্যকে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য এক বিন্দু ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিলেন যে, শরবৎ প্রস্তুত করিয়া এই ঔষধবিন্দু তাহাতে মিশাইয়া শরাব বলিয়া পান করিতে দিবে। নির্ম্মল তাহাই করাইলেন। উদিপুরী তাহা পান করিয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন, “অতি উৎকৃষ্ট মদ্য।” এবং অল্পকাল মধ্যেই নেশায় অভিভূত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ

জেব-উন্নিসা একা বসিয়া আছেন। দুই একজন পরিচারিকা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। নির্ম্মলকুমারীও দুই একবার তাঁহার খবর লইতেছেন। ক্রমশঃ জেব-

উন্নিসা উদিপুরীর বিভ্রাটবার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি নিজের জন্য চিন্তিত হইলেন।

পরিশেষে তাঁহাকেও নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি না বিনীত, না গর্ব্বিত ভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি যে আলমগীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না।

চঞ্চলকুমারী অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত পৃথক আসনে বসাইলেন এবং নানাবিধ আলাপ করিলেন। জেব-উন্নিসাও সৌজন্যের সহিত কথার উত্তর করিলেন। পরস্পরে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, এমন কথা কেহই কিছুই বলিলেন না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারী তাঁহার উপযুক্ত পরিচর্য্যার আদেশ দিলেন। এবং জেব-উন্নিসাকে আতর ও পান দিলেন।

কিন্তু জেব-উন্নিসা, না উঠিয়া বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?"

চঞ্চল। সে কথা আপনাকে বলা হয় নাই। না বলিলেও চলে। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অদ্য একা শয়ন করিবেন। দ্বার খুলিয়া রাখিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কাল তাহা বলিবেন, ইহা আপনার নিকট প্রার্থনা।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নির্ম্মলকুমারীর যত্নে তাঁহার আহার ও শয্যার পারিপাট্য যেমন দিল্লীর রঙ্‌মহালে ঘটিত, তেমনই ঘটিল। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইলেন না। চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত দ্বার খুলিয়া রাখিয়া একাই শয়ন করিলেন; কেন না, অবাধ্য হইলে যদি চঞ্চলকুমারী, উদিপুরীর দশার মত তাঁহারও কোন দুর্দ্দশা ঘটান, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু একা সমস্ত রাত্রি দ্বার খুলিয়া রাখাতেও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল। মনে ভাবিলেন যে, ইহাই সম্ভব যে, গোপনে আমার উপর কোন অত্যাচার হইবে, এই জন্য এমন বন্দোবস্ত হইয়াছে। অতএব স্থির করিলেন, নিদ্রা যাইবেন না, সতর্ক থাকিবেন।

কিন্তু দিবসে অনেক কষ্ট গিয়াছিল, এজন্য নিদ্রা যাইব না, জেব-উন্নিসা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও, তন্দ্রা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অধিকার করিতে লাগিল। যে নিদ্রা যাইব না প্রতিজ্ঞা করে, তন্দ্রা আসিলেও মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; তন্দ্রাভিভূত হইলেও একটু বোধ থাকে যে, আমার ঘুমান হইবে না। জেব-উন্নিসা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চমকে চমকে ঘুম ভাঙ্গিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই আপনার অবস্থা মনে পড়িতেছিল। কোথায় দিল্লীর বাদশাহজাদী, কোথায় উদয়পুরের বন্দিনী! কোথায় মোগল বাদশাহীর রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী, মোগল বাদশাহীর আকাশের পূর্ণচন্দ্র, তক্তে তাউসের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন, কাবুল হইতে বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাঁহার বাহুবলে শাসিত, তাঁহার দক্ষিণ বাহু,–আর কোথায় আজ গিরিগুহানিহিত উদয়পুরের কোটরে মূষিকবৎ পিঞ্জরাবদ্ধা, রূপনগরের ভুঁইঞার মেয়ের বন্দিনী, হিন্দুর ঘরে অস্পর্শীয়া শূকরী, হিন্দুপরিচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্ককারী কীট! মরণ কি ইহার অপেক্ষা ভাল নহে? ভাল বৈ কি? যে মরণ তিনি প্রাণাধিক প্রিয় মবারককে দিয়াছেন, সে ভাল না ত কি? যা মবারককে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য–নিজে কি তিনি সেই মরণের যোগ্য? হায় মবারক! মবারক! মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গগরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল! এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কালভুজঙ্গীকে দংশন করে? মানুষী কালভুজঙ্গী কি ফণিনী কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না! হায় মবারক! মবারক! মবারক! তুমি একবার সশরীর দেখা দিয়া কালভুজঙ্গী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও; আমি মরি কি না দেখ।

ঠিক এই কথা ভাবিয়া যেন মবারককে সশরীর দর্শন করিবার মানসেই জেব-উন্নিসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীর মবারক! জেব-উন্নিসা চীৎকার করিয়া, চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে ইন্ধনক্ষেপ–জ্বালা বাড়িল

পরদিন যখন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। একে ত পূর্ব্বেই মূর্ত্তি শীর্ণা বিবর্ণা, কাদম্বিনীচ্ছায়াপ্রচ্ছন্নাবৎ হইয়াছিল–আজ আরও যেন কি হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত্র আগুনের তাপের নিকট বসিয়া থাকিলে মানুষে যেমন হয়, চিতারোহণ করিয়া, না পুড়িয়া কেবল ধূম ও তাপে অর্দ্ধদগ্ধা হইয়া চিতা হইতে নামিলে যেমন হয়, জেব-উন্নিসাকে আজ তেমনই দেখাইতেছিল। জেব-উন্নিসা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুড়িতেছিল।

বেশভূষা না করিলে নয়; জেব-উন্নিসা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বেশভূষা করিয়া, নিয়ম ও অনুরোধ রক্ষার্থ জলযোগ করিল। তার পর প্রথমে উদিপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। দেখিল, উদিপুরী একা বসিয়া আছে–সম্মুখে কুমারী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি এবং একটি যিশুর ক্রস। অনেক দিন উদিপুরী যিশুকে এবং তাঁহার মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুর্দ্দিনে তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। খ্রিষ্টিয়ানির চিহ্নস্বরূপ এই দুইটি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; বৃষ্টির দিনে দুঃখীর পুরাণ ছাতির মত, আজ তাহা বাহির হইয়াছিল। জেব-উন্নিসা দেখিলেন, উদিপুরীর চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতেছে; বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, বিন্দুর পশ্চাৎ বিন্দু, নিঃশব্দে দুগ্ধালক্তকনিন্দী গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে। জেব-উন্নিসা উদিপুরীকে এত সুন্দর কখনও দেখেন নাই। সে স্বভাবতঃ পরম সুন্দরী–কিন্তু গর্ব্বে, ভোগবিলাসে, ঈর্ষ্যাদির জ্বালায়, সর্ব্বদাই সে অতুল সৌন্দর্য্য একটু বিকৃত হইয়া থাকিত। আজ অশ্রুস্রোতে সে বিকৃতি ধুইয়া গিয়াছিল–অপূর্ব্ব রূপরাশির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

উদিপুরী জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আপনার দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি বাঁদী ছিলাম–বাঁদীর দরে বিক্রীত হইয়াছিলাম–কেন বাঁদীই রহিলাম না! কেন আমার কপালে ঐশ্বর্য্য ঘটিয়াছিল!–"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদিপুরী, জেব-উন্নিসার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি হইয়াছিল? কাফের তোমার উপরও কি অত্যাচার করিয়াছে?"

জেব-উন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কাফেরের সাধ্য কি? আল্লা করিয়াছেন।"

উদিপুরী। সকলই তিনি করেন, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, শুনিতে পাই না?

জেব। এখন সে কথা মুখে আনিতে পারিব না। মৃত্যুকালে বলিয়া যাইব।

উদি। যাই হৌক, ঈশ্বর যেন রাজপুতের এ স্পর্দ্ধার দণ্ড করেন।

জেব। রাজপুতের ইহাতে কোন দোষ নাই।

এই কথা বলিয়া জেব-উন্নিসা নীরব হইয়া রহিল। উদিপুরীও কিছু বলিল না। পরিশেষে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেব-উন্নিসা উদিপুরীর নিকট বিদায় চাহিল।

উদিপুরী বলিল, "কেন, তোমাকে কি ডাকিয়াছে?"

জেব। না।

উদি। তবে উপযাচক হইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি বাদশাহের কন্যা।

জেব। আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

উদি। সাক্ষাৎ কর ত জিজ্ঞাসা করিও যে, কত আশরফি পাইলে এই গাঁওয়ারেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে?

“করিব।” বলিয়া জেব-উন্নিসা বিদায় লইলেন। পরে চঞ্চলকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের মত সম্মান করিলেন; এবং রীতিমত স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল ত?”

জেব। না। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভয়ে ঘুমাই নাই।

চঞ্চল। তবে কিছু স্বপ্নে দেখেন নাই?

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি।

চঞ্চল। ভাল, না মন্দ?

জেব। ভাল, না মন্দ, তাহা বলিতে পারি না–ভাল ত নহেই। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার কাছে আমার ভিক্ষা আছে।

চঞ্চল। বলুন।

জেব। আর তাহা দেখিতে পাই কি?

চঞ্চল। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিলে বলিতে পারি না। আমি পাঁচ সাত দিন পরে, দৈবজ্ঞের কাছে লোক পাঠাইব।

জেব। আজ পাঠান যায় না?

চঞ্চল। এত কি ত্বরা বাদশাহজাদী?

জেব। এত ত্বরা, যদি আপনি এই মুহূর্ত্তে তাহা দেখাইতে পারেন, তবে আমি আপনার বাঁদী হইয়া থাকিতেই চাহিব।

চঞ্চল। বিস্ময়কর কথা শাহজাদী! এমন কি সামগ্রী?

জেব-উন্নিসা উত্তর করিল না। তাহা চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া চঞ্চলকুমারী দয়া করিল না। বলিল, “আপনি পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।”

তখন জেব-উন্নিসা, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেল। যেখানে তাহার যাইতে নাই, সেখানে গেল। যে শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর ছিন্ন লতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া, চঞ্চলকুমারীর পায়ের উপর মুখ রাখিয়া, পদ্মের উপর পদ্মখানি উল্টাইয়া দিয়া, অশ্রুশিশিরে তাহা নিষিক্ত করিল। বলিল, “আমার প্রাণ রক্ষা কর! নহিলে আজ মরিব।”

চঞ্চলকুমারী তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন–তিনিও হিন্দু মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, “শাহজাদী! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।”

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন।

এ দিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না। নিরাশ হইয়া উদিপুরী স্বয়ং চঞ্চলকুমারীর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

সাক্ষাৎ হইলে উদিপুরী চঞ্চলকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত আশরফি পাইলে চঞ্চলকুমারী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।” চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “যদি বাদশাহ ভারতবর্ষের সকল মসজিদ–মায় দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন, আর ময়ূরতক্ত এখানে বহিয়া দিয়া যাইতে পারেন, আর বৎসর বৎসর আমাদিগকে রাজকর দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে তোমাদের ছাড়িয়া দিতে পারি।”

উদিপুরী ক্রোধে অধীর হইল। বলিল, "গাঁওয়ার ভুঁইঞার ঘরে এত স্পর্দ্ধা আশ্চর্য্য বটে!"

এই বলিয়া উদিপুরী উঠিয়া চলিয়া যায়। চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "বিনা হুকুমে যাও কোথায়? তুমি গাঁওয়ার ভুঁইয়ারাণীর বাঁদী, তাহা মনে নাই?" পরে একজন পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, "আমার এই নূতন বাঁদীকে আর আর মহিষীদিগের নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া আসিও। পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকোর খরিদা বাঁদী।"

উদিপুরী কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার সঙ্গে চলিল। পরিচারিকা রাজসিংহের আর আর মহিষীদিগের নিকট, ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী মহিষীকে দেখাইয়া আনিল।

নির্ম্মল আসিয়া চঞ্চলকে বলিল, "মহারাণি! আসল কথাটা ভুলিতেছ? কি জন্য উদিপুরীকে ধরিয়া আনিয়াছি? জ্যোতিষীর গণনা মনে নাই?"

চঞ্চলকুমারী হাসিয়া বলিল, "সে কথা ভুলি নাই। তবে সে দিন বেগম বড় কাতর হইয়া পড়িল বলিয়া আর পীড়ন করিতে পারিলাম না। কিন্তু বেগম আপনা হইতেই আমার দয়াটুকু শুকাইয়া তুলিতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শাহজাদী ভস্ম হইল

অর্দ্ধ রাত্রি অতীত; সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। জেব-উন্নিসা বাদশাহ-দুহিতা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা, কদাচিৎ দাবাগ্নিপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রীর মত কোপতীব্রা। কিন্তু তখনই যেন বা শরবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে মধ্যে গভীর হুঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়নপথলক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার–কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্তকাননে কুসুমরাজি তুল্য, সমুদ্রে ফেননিচয় তুল্য এবং কামিনীকমনীয় দেহে রত্নরাশি তুল্য, এক স্থানে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে–আর সর্ব্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্রিগ্রহণগুরুগর্জ্জিত",–কখন বা একমাত্র কামানের, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা; রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি। সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে বিষণ্নমনে জেব-উন্নিসা ভাবিতেছিল, "ঐ যে কামান ডাকিল, বোধ হয় মোগলের কামান–নহিলে কামান অমন ডাকিতে জানে না। আমার পিতার তোপ ডাকিল–এমন শত শত তোপ আমার বাপের আছে–একটাও কি আমার হৃদয়ের জন্য নহে? কি করিলে এই তোপের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া, তোপের আগুনে সকল জ্বালা জুড়াই? কাল সৈন্যমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্যের শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিয়াছিলাম–তার একখানিতে আমার সব জ্বালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিষিয়া মরিতে পারিতাম,–কৈ? সে চেষ্টাও ত করি নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ করি নাই কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুঁড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উদ্যোগ করিয়া মরি।"

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু, মুক্তদ্বার কক্ষমধ্যে, অতি বেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে জেব-উন্নিসার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। জেব-উন্নিসা ভাবিতে লাগিল, "ভয় কেন? এই ত মরণ কামনা করিতেছিলাম! যে মরিতে চাহে, তার আবার কিসের ভয়? ভয়? কাল মরা মানুষ দেখিয়াছি, আজও বাঁচিয়া আছি। বুঝি যেখানে মরা মানুষ থাকে, সেইখানে যাইব, ইহা নিশ্চিত; তবে ভয় কিসের? তবে বেহেস্ত আমার কপালে নাই–বুঝি

জাহান্নায় যাইতে হইবে, তাই এত ভয়! তা, এত দিন এ সকল কথা কিছুই বিশ্বাস করি নাই। জাহান্নাও মানি নাই, বেহেস্তও মানি নাই; খোদাও জানিতাম না, দীন্‌ও জানিতাম না। কেবল ভোগবিলাসই জানিতাম। আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে? ঐশ্বর্য্যেই আমার জীবন বিষময় হইল। তোমায় আমি তাই চিনিলাম না। ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তুমি ত জান! জানিয়া শুনিয়া নির্দ্দয় হইয়া কেন এ দুঃখ দিলে? আমার মত ঐশ্বর্য্য কাহার কপালে ঘটিয়াছে? আমার মত দুঃখী কে?

শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল—রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগমের নিষেধ নাই—কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। যে কোমলাঙ্গে পুষ্পধন্বাও শরাঘাতের সময়ে মৃদুহস্তে বাণক্ষেপ করেন, তাহাতে কীট অবলীলাক্রমে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল। জেব-উন্নিসা জ্বালায় একটু কাতর হইল। তখন জেব-উন্নিসা মনে মনে একটু হাসিল। ভাবিল, "পিপীলিকার দংশনে আমি কাতর! এই অনন্ত দুঃখের সময়েও কাতর! আপনি পিপীলিকাদংশন সহ্য করিতে পারিতেছি না, আর অবলীলাক্রমে আমি, যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহাকে ভুজঙ্গমদংশনে প্রেরণ করিলাম। এমন কেহ নাই কি যে, আমাকে তেমনই বিষধর সাপ আনিয়া দেয়! হয় সাপ, নয় মবারক!"

প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণায় সময়, অধিক ক্ষণ ধরিয়া একা, মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে মনের কোন কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে, গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্যে হইতে সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ! নয় মবারক!" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল, "মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না?"

"এ কি এ?" বলিয়া জেব-উন্নিসা উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। যেমন গীতধ্বনি শুনিয়া হরিণী উন্নমিতাননে উঠিয়া বসে; তেমনই করিয়া জেব-উন্নিসা উঠিয়া বসিল। বলিল, "এ কি এ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ?"

উত্তর হইল, "কার?"

জেব-উন্নিসা বলিল, "কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে! সে কি ছায়া মাত্র নহে? তুমি কি প্রকারে বেহেস্ত হইতে আসিতেছ, যাইতেছ, মবারক? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত, না জীবিত? আসিরদ্দীন কি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে—আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত জন্য বসিতে পার না? তুমি যদি ছায়া মাত্রই হও, তবু আমার ভয় নাই। একবার বসো।"

উত্তর, "কেন?"

জেব-উন্নিসা সকাতরে বলিল, "আমি কিছু বলিব। আমি যাহা কখন বলি নাই, তাহা বলিব।"

মবারক—(বলিতে হইবে না যে, মবারক সশরীর উপস্থিত) তখন অন্ধকারে, জেব-উন্নিসার পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসিল। জেব-উন্নিসার বাহুতে তাহার বাহু স্পর্শ হইল,—জেব-উন্নিসার শরীর হর্ষকণ্টকিত, আহ্লাদে পরিপ্লুত হইল;—অন্ধকারে মুক্তার সারি গণ্ড দিয়া বহিল। জেব-উন্নিসা আদরে মবারকের হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইল। বলিল, "ছায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুমি যা বলিয়া ভুলাও, আমি ভুলিব না। আমি তোমার; আবার তোমায় ছাড়িব না।" তখন জেব-উন্নিসা সহসা পালঙ্ক হইতে নামিয়া, মবারকের পায়ের উপর পড়িল; বলিল, "আমায় ক্ষমা কর! আমি ঐশ্বর্য্যের গৌরবে পাগল হইয়াছিলাম। আমি আজ শপথ করিয়া ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলাম – তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইব না। বল তুমি জীবিত!"

মবারক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি জীবিত। একজন রাজপুত আমাকে কবর হইতে তুলিয়া চিকিৎসা করিয়া প্রাণদান দিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে আমি এখানে আসিয়াছি।"

জেব-উন্নিসা পা ছাড়িল না। তাহার চক্ষুর জলে মবারকের পা ভিজিয়া গেল। মবারক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। কিন্তু জেব-উন্নিসা উঠিল না; বলিল, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।"

মবারক বলিল, "তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। না করিলে, তোমার কাছে আসিতাম না।"

জেব-উন্নিসা বলিল, "যদি আসিয়াছ, যদি ক্ষমা করিয়াছ, তবে আমায় গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছা হয় আমাকে সাপের মুখে সমর্পণ কর, না ইচ্ছা হয়, যাহা বল, তাহাই করিব। আমায় আর ত্যাগ করিও না। আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, আর দিল্লী যাইতে চাহিব না; আলম্‌গীর বাদশাহের রঙ্‌মহালে আর প্রবেশ করিব না। আমি শাহজাদা বিবাহ করিতে চাহি না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

মবারক সব ভুলিয়া গেল–সর্পদংশনজ্বালা ভুলিয়া গেল– আপনার মরিবার ইচ্ছা ভুলিয়া গেল–দরিয়াকে ভুলিয়া গেল। জেব-উন্নিসার প্রীতিশূন্য অসহ্য বাক্য ভুলিয়া গেল। কেবল জেব-উন্নিসার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল; জেব-উন্নিসার প্রেমপরিপূর্ণ কাতরোক্তি তাহার কর্ণমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল; শাহজাদীর দর্প চূর্ণিত দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। তখন মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন এই গরিবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?"

জেব-উন্নিসা যুক্তকরে সজলনয়নে বলিল, "এত ভাগ্য কি আমার হইবে?"

বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র। মবারক বলিল, "তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, আমার সঙ্গে আইস।"

আলো জ্বালিবার সামগ্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল। মবারক আলো জ্বালিয়া ফানুসের ভিতর রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথামত জেব-উন্নিসা বেশভূষা করিলেন। তাহা সমাপন হইলে, মবারক তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন। তথা প্রহরিণীগণ নিযুক্ত ছিল। তাহারা মবারকের ইঙ্গিতে দুই জনে মবারক ও জেব-উন্নিসার সঙ্গে চলিল। মবারক যাইতে যাইতে জেব-উন্নিসাকে বুঝাইলেন যে, রাজাবরোধ মধ্যে পুরুষের আসিবার উপায় নাই। বিশেষ মুসলমানের ত কথাই নাই। এই জন্য তিনি রাত্রিতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাও মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহেই পারিয়াছেন, এবং তাই এই প্রহরিণীদিগের সাহায্য পাইয়াছেন। সিংহদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বাহিরে মবারকের ঘোড়া এবং জেব-উন্নিসার জন্য দোলা প্রস্তুত আছে।

প্রহরিণীদিগের সাহায্যে সিংহদ্বারের বাহির হইয়া, তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব স্থানে আরোহণ করিলেন। উদয়পুরেও দুই চারি জন মুসলমান সওদাগরী ইত্যাদি উপলক্ষে বাস করিত। তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মবারক জেব-উন্নিসাকে সেই মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে একজন মোল্লা ও উকীল ও গোওয়া উপস্থিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরা মত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

তখন মবারক বলিলেন, "এখন তোমাকে যেখান হইতে লইয়া আসিয়াছি, সেইখানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কেন না, এখনও তুমি মহারাণার বন্দী। কিন্তু ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মুক্তি পাইবে।"

এই বলিয়া মবারক জেব-উন্নিসাকে পুনর্ব্বার তাঁহার শয্যাগৃহে রাখিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষা

পরদিন পূর্ব্বাহ্নকালে চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব-উন্নিসা বসিয়া প্রফুল্লবদনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত। দুই দিনের রাত্রিজাগরণে শরীর ম্লান–দুশ্চিন্তার দীর্ঘকাল ভোগে বিশীর্ণ। যে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া সীস্ মহলের দর্পণে দর্পণে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত

যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগবিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয়; স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র–কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত–কেবল পঙ্কময়।

জেব-উন্নিসা এক্ষণে অকপটে গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিনীতভাবে চঞ্চলকুমারীর নিকট গত রাত্রির ঘটনা সকল বিবৃত করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমারী সকলই জানিত। সকল বলিয়া, জেব-উন্নিসা যুক্তকরে চঞ্চলকুমারীকে বলিলেন, "মহারাণি! আমায় আর বন্দী রাখিয়া আপনার কি ফল? আমি যে আলম্‌গীর বাদশাহের কন্যা, তাহা আমি ভুলিয়াছি। আপনি তাঁহার কাছে পাঠাইলেও আমার আর যাইতে ইচ্ছা নাই। গেলেও বোধ করি, আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার স্বদেশ তুর্কস্থানে চলিয়া যাই।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "এ সকল কথার উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। কর্ত্তা মহারাণা স্বয়ং। তিনি আপনাকে আমার কাছে রাখিতে পাঠাইয়াছেন, আমি আপনাকে রাখিতেছি। তবে এই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য মহারাণার সেনাপতি মাণিকলাল সিংহ দায়ী। আমি মাণিকলালের নিকট বিশেষ বাধিত, তাই তাঁহার কথায় এতটা করিয়াছি। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার কোন উপদেশ পাই নাই। অতএব সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা বিষণ্ণভাবে বলিল, "মহারাণাকে আমার এ ভিক্ষা আপনি কি জানাইতে পারেন না? তাঁহার শিবির এমন অধিক দূরে ত নহে। কাল রাত্রে পর্ব্বতের উপর তাঁহার শিবিরের আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "পাহাড় যত নিকট দেখায়, তত নিকট নয়। আমরা পাহাড়ে দেশে বাস করি, তাই জানি। আপনিও কাশ্মীর গিয়াছিলেন, এ কথা আপনার স্মরণ হইতে পারে। তা যাই হোক, লোক পাঠান কষ্টসাধ্য নহে। তবে, রাণা যে এ কথায় সম্মত হইবেন, এমন ভরসা করি না। যদি এমন সম্ভব হইত যে, উদয়পুরের ক্ষুদ্র সেনা মোগল রাজ্য এই এক যুদ্ধে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিত, যদি বাদশাহের সঙ্গে আমাদের আর সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে অবশ্য তিনি আপনাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে পারিতেন। কিন্তু যখন সন্ধি অবশ্য এক দিন না এক দিন করিতে হইবে, তখন আপনাদিগকেও বাদশাহের নিকট অবশ্য ফেরৎ দিতে হইবে।"

জেব। তাহা হইলে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইবেন। এ বিবাহের কথা জানিতে পারিলে, বাদশাহ আমাকে বিষভোজন করাইবেন। আর আমার স্বামীর ত কথাই নাই। তিনি আর কখনও দিল্লী যাইতে পাইবেন না। গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিবাহে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, মহারাণি?

চঞ্চল। যাহাতে কোন উৎপাত না ঘটে, এমন উপায় করা যাইতে পারে, বোধ হয়।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে নির্ম্মলকুমারী সেখানে কিছু ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মল, চঞ্চলকে প্রণাম করার পর, জেব-উন্নিসাকে অভিবাদন করিলেন। জেব-উন্নিসাও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তার পর চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ম্মল, এত ব্যস্তভাবে কেন?"

নির্ম্মল। বিশেষ সংবাদ আছে।

তখন জেব-উন্নিসা উঠিয়া গেলেন। চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের সংবাদ না কি?"

নির্ম্মল। আজ্ঞা হাঁ।

চঞ্চল। তা ত লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি। ইন্দুর গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মহারাণা গর্ত্তের মুখ বুজাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইন্দুর না কি গর্ত্তের ভিতর মরিয়া পচিয়া থাকিবার মত হইয়াছে।

নি। তার পর, আর একটা কথা আছে। ইন্দুর বড় ক্ষুধার্ত্ত। আমার সেই পায়রাটি আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাদশাহ ছাড়িয়া দিয়াছেন–তাহার পায়ে

একখানি রোক্‌কা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

চ। রোক্‌কা দেখিয়াছ?

নি। দেখিয়াছি।

চ। কাহার বরাবর?

নি। ইম্‌লি বেগম।

চ। কি লিখিয়াছে?

নির্ম্মল পত্রখানি বাহির করিয়া কিয়দংশ এইরূপ পড়িয়া শুনাইলেন–

"আমি তোমায় যেরূপ স্নেহ করিতাম, কোন মনুষ্যকে কখনও এমন স্নেহ করি নাই। তুমিও আমার অনুগত হইয়াছিলে। আজ পৃথিবীশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন–লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। অনাহারে মরিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ আজ এক টুকরা রুটির ভিখারী। কোন উপকার করিতে পার না কি? সাধ্য থাকে, করিও। এখনকার উপকার কখনও ভুলিব না।"

শুনিয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপকার করিবে?"

নির্ম্মল বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। আর কিছু না পারি, বাদশাহের জন্য আর যোধপুরী বেগমের জন্য কিছু খাদ্য পাঠাইয়া দিব।"

চ। কি রকমে? সেখানে ত মনুষ্য সমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা এখন বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্ম্মলকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, শিবিরে স্বামিসন্দর্শনে গেলেন। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে না কি?"

নি। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য?

মাণিক। তা ত নই। কিন্তু আলম্‌গীর বাদশাহ?

নি। আমি তাঁর ইম্‌লি বেগম–তার সঙ্গে কি যুদ্ধের সম্বন্ধ? আমি তাঁর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তার পর মাণিকলালে ও নির্ম্মলকুমারীতে কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। অনেক কথা হইল, ইহাই জানি।

মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতিপ্রেরণ করিয়া, রাজসিংহের সাক্ষাৎকার লাভের অভিপ্রায়ে রাণার তাম্বুতে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "যদি এ দাসকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান মহারাজের অভিপ্রায় হয়, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে কি হইয়াছে?"

মাণিকলাল উত্তর করিল, "এখানে ত কোন কাজ নাই। কাজের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মোগলদিগের শুষ্ক মুখ দেখা ও আর্ত্তনাদ শুনা। তাহা কখনও কখনও পর্ব্বতের

উপর গাছে চড়িয়া দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে কাজ, যে সে পারিবে। আমি ভাবিতেছি কি যে, এতগুলা মানুষ, হাতী, ঘোড়া, উট, এই রন্ধ্রে পচিয়া মরিয়া থাকিবে,–দুর্গন্ধে উদয়পুরেও কেহ বাঁচিবে না–বড় মড়ক উপস্থিত হইবে।"

রাণা বলিলেন, "অতএব তোমার বিবেচনা এই, মোগল সেনাকে অনাহারে মারিয়া ফেলা অকর্ত্তব্য?"

মাণিক। বোধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ জনকে মারিলেও দেখিয়া দুঃখ হয় না। বসিয়া বসিয়া অনাহারে একজন লোকও মরিলে দুঃখ হয়।

রাণা। তবে উহাদিগের সম্বন্ধে কি করা যায়?

মাণিক। মহারাজ! আমার এত বুদ্ধি নাই যে, আমি এমন বিষয়ে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নির দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করা ভাল।

রাজসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগান পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল। তথা প্রদান সেনাপতিগণ, প্রধান রাজমন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান দয়াল সাহা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। মাণিকলালও ছিল।

রাজসিংহ বিচার্য্য বিষয়টা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, সভাসদ্‌গণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকেই বলিলেন, "মোগল ঐখানে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিয়া পচিয়া থাকুক–ঔরঙ্গজেবের বেটাকে ধরিয়া আনিয়া উহাদের গোর দেওয়াইব। না হয়, দোসাদের দল আনিয়া মাটি চাপা দেওয়াইব। মোগল হইতে বার বার রাজপুতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, কাহারও ইচ্ছা হইবে না যে, মোগলকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায়।"

ইহার উত্তরে মহারাণা বলিলেন, "না হয় স্বীকার করিলাম যে, এই মোগলদিগকে এইখানে শুকাইয়া মারিয়া মাটি চাপা দেওয়া গেল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব আর ঔরঙ্গজেবের উপস্থিত সৈন্যগণ মরিলেই মোগল নিঃশেষ হইল না। ঔরঙ্গজেব মরিলে শাহ আলম বাদশাহ হইবে। শাহ আলমের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী মহাসৈন্য পর্ব্বতের অপর পারে সশস্ত্রে উপস্থিত আছে। আর দুইটা মোগলসেনা আর দুই দিকে বসিয়া আছে। আমরা কি এই সকলগুলিকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারিব? যদি না পারি, তবে অবশ্য একদিন সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে এমন সুসময় আর কবে হইবে? এখন ঔরঙ্গজেবের প্রাণ কণ্ঠাগত–এখন তাহার কাছে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। সময়ান্তরে কি তেমন পাইব?"

দয়াল সাহা বলিলেন, "নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাপিষ্ঠ পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ ঔরঙ্গজেবকে বধ করিলেই পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করা হইবে। এমন পুণ্য আর কোন কার্য্যে নাই, মহারাজ মতান্তর করিবেন না।"

রাজসিংহ বলিলেন, "সকল মোগল বাদশাহই দেখিলাম–পৃথিবীর কণ্টক। ঔরঙ্গজেব শাহজাঁহার অপেক্ষাও কি নরাধম? খস্রু হইতে আমাদের যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, ঔরঙ্গজেব হইতে কি তত হইয়াছে? শাহ আলম যে পিতৃপিতামহ হইতেও দুরাচার না হইবে, তাহার স্থিরতা কি? আর তোমরা যদি এমন ভরসাই কর–যে ভরসা আমিও না করি, তা নয়–যে এই চারিটি মোগল সেনাই আমরা পরাজিত করিতে পারিব, তবে ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্যহত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে কয় জন? আমরা অল্পসংখ্যক; মুসলমান বহুসংখ্যক। আমরা সংখ্যায় কমিয়া গেলে, আবার যদি মোগল আসে, তবে কার বাহুবলে তাদের আবার তাড়াইব?"

দয়াল সাহা বলিল, “মহারাজ! সমস্ত রাজপুতানা একত্রিত হইলে মোগলকে সিন্ধু পার করিয়া রাখিয়া আসিতে কতক্ষণ লাগে?”

রাজসিংহ বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা কখনও হইয়াছে কি? এখনও ত সে চেষ্টা করিতেছি—ঘটিতেছে কি? তবে সে ভরসা কি প্রকারে করিব?”

দয়াল সাহা বলিলেন, “সন্ধি হইলেও ঔরঙ্গজেব সন্ধি রক্ষা করিবে, এমন ভরসা করি না। অমন মিথ্যাবাদী, ভণ্ড কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মুক্তি পাইলেই, সে সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, যা করিতেছিল, তাহাই করিবে।”

রাজসিংহ বলিলেন, “তাহা ভাবিলে কখনই সন্ধি করা হয় না। তাই কি মত?”

এইরূপ অনেক বিচার হইল। পরিশেষে সকলেই রাণার কথার যথার্থ্য স্বীকার করিলেন। সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল।

তখন কেহ আপত্তি করিল, “ঔরঙ্গজেব ত কই, সন্ধির চেষ্টায় দূত পাঠান নাই। তাঁর গরজ, না আমাদের গরজ?”

তাহাতে রাজসিংহ উত্তর করিলেন, “দূত আসিবে কি প্রকারে? সে রন্ধ্রপথের ভিতর হইতে একটি পিঁপ্‌ড়া উপরে আসিবার পথ রাখি নাই।”

দয়াল সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আমাদেরই বা দূত যাইবে কি প্রকারে? সেবার ঔরঙ্গজেব আমাদিগের দূতকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, এবার যে সে আজ্ঞা দিবে না, তার ঠিকানা কি?”

রাজসিংহ বলিলেন, “এবার যে বধ করিবে না, তাহা স্থির। কেন না, এখন কপট সন্ধিতেও তাহার মঙ্গল। তবে দূত সেখানে যাইবে কি প্রকারে, তাহা গোলযোগ আছে বটে?”

তখন মাণিকলাল নিবেদন করিল, “সে ভার আমার উপর অর্পিত হউক। আমি মহারাণার পত্র ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিব, এবং উত্তর আনিয়া দিব।”

সকলেই সে কথায় বিশ্বাস করিল; কেন না, সকলেই জানিত, কৌশলে ও সাহসে মাণিকলাল অদ্বিতীয়। অতএব পত্র লিখিবার হুকুম হইল। দয়াল সাহা পত্র প্রস্তুত করাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—বাদশাহ, সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয়ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবি করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

পত্র সভাসদ সকলকে শুনান হইল। শুনিয়া মাণিকলাল বলিল, “বাদশাহের স্ত্রী কন্যা আমাদিগের নিকট বন্দী আছে। তাহারা থাকিবে?”

বলিবামাত্র সভামধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বলিল, “ছাড়া হইবে না।” কেহ বলিল, থাক্। উহারা মহারাণার আঙ্গিনা ঝাঁটাইবে।” কেহ বলিল, “উহাদের ঢাকায় পাঠাইয়া দাও। হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণবী সাজিয়া, হরিনাম করিবে।” কেহ বলিল, “উহাদের মূল্যস্বরূপ এক এক ক্রোর টাকা বাদশাহ দিবেন।” ইত্যাদি নানা প্রকার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বলিলেন, “দুইটা মুসলমান বাঁদীর জন্য সন্ধি ত্যাগ করা হইবে না। সে দুইটাকে ফিরাইয়া দিব, লিখিয়া দাও।”

সেইরূপ লেখা হইল। পত্রখানি মাণিকলালের জিম্মা হইল। তখন সভাভঙ্গ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : অগ্নিতে জলসেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। সকলেই চলিয়া গেল, মাণিকলাল গোপনে মহারাণাকে জানাইল, “মবারকের বখ্‌শিশের কথাটা এই সময়ে

মহারাজকে স্মরণ করিয়া দিতে হয়।”

রাজসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি চায়?”

মাণিক। বাদশাহের যে কন্যা আমাদিগের কাছে বন্দী আছে, তাহাকেই চায়।

রাজসিংহ। তাহাকে যদি বাদশাহের নিকট ফেরৎ না পাঠাই, তবে বোধ করি, সন্ধি হইবে না। আর স্ত্রীলোকের উপর কি প্রকারে আমি পীড়ন করিব?

মাণিক। পীড়ন করিতে হইবে না। শাহজাদীর সঙ্গে মবারকের গত রাত্রে সাদী হইয়াছে।

রাজসিংহ। সেই কথা শাহজাদী বাদশাহকে বলিলেই বোধ হয়, সব গোল মিটিবে।

মাণিক। এক রকম–কেন না, দুই জনেরই মাথা কাটা যাইবে।

রাজসিংহ। কেন?

মাণিক। শাহজাদীদের শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ নাই। এই শাহজাদী একজন ক্ষুদ্র সৈনিককে বিবাহ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের কুলের কলঙ্ক করিয়াছে। বিশেষ বাদশাহকে না জানাইয়া এ বিবাহ করিয়াছে, এজন্য তাহাকে দিল্লীর রঙ্‌মহালের প্রথানুসারে বিষ খাইতে হইবে। আর মবারক সাপের বিষে যখন মরেন নাই, তখন তাঁহাকে হাতীর পায়ে, কি শূলে যাইতে হইবে। যদি যে অপরাধও মার্জ্জনা হয়, তবে তিনি মহারাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য বাদশাহের কাছে শূলে যাইবার যোগ্য। জানিতে পারিলে বাদশাহ তাঁহাকে শূলে দিবে। তাহা ছাড়া তিনি বিনানুমতিতে শাহজাদী বিবাহ করিয়াছেন, সে জন্যও শূলে যাইতে বাধ্য।

রাজসিংহ। আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি?

মাণিক। ঔরঙ্গজেব, কন্যা জামাতাকে মার্জ্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না, এই নিয়ম করিতে পারেন।

রাজসিংহ বলিলেন, “তাহা আমি করিতে স্বীকৃত হইতেছি। উহাদের জন্য আমি একখানি পৃথক পত্র বাদশাহকে লিখিতেছি। তাহাও তুমি ঐ সঙ্গে লইয়া যাও। ঔরঙ্গজেব কন্যাকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু মবারককে মার্জ্জনা করিতে তিনি আপাততঃ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে যে তিনি নিষ্কৃতি দিবেন, এমন আমার ভরসা হয় না। যাই হউক, মবারক যদি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তবে আমি ইহা করিতে প্রস্তুত আছি।”

এই বলিয়া রাজসিংহ একখানি পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন। মাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া সেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল।

উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্ম্মলকুমারীকে এই সকল সংবাদ দিলেন। নির্ম্মল সন্তুষ্ট হইল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল–

“শাহান্‌শাহ!

বাঁদীর অসংখ্য কুর্ণিশ। হুজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হুজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।”

সে পত্রও নির্ম্মল মাণিকলালকে দিল। তার পর নির্ম্মল, জেব-উন্নিসাকে সকল কথা জানাইল, তিনিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে মাণিকলাল মবারককে সকল কথা জানাইলেন। মবারক কিছু বলিল না। মাণিকলাল তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, “সাহেব! বাদশাহের নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি যে আপনাকে যথার্থ মার্জ্জনা করিবেন, এমন ভরসা আমি করি না।”

মবারক বলিল, “নাই করুন।”

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোন মতে উড়িয়া যেখানে ঔরঙ্গজেব ঊর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে বাদশাহের কাছে পত্র পৌঁছাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ : অগ্নিনির্ব্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন।”কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, “চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।” রাজসিংহ বলিলেন, “তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সসৈন্যে কবর দেওয়া আমার মনোমত।” কাজেই ঔরঙ্গজেবকে সে বাসনা ছাড়িতে হইল। তিনি সন্ধিতে সম্মত হইয়া মুন্‌শীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লেখাইয়া আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া, স্বহস্তে তাহাতে “মঞ্জুর” লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত্ত এই করিলেন যে, এ বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কন্যা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া মোগল সেনা মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এই জন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া, অনেক আহার্য্য বস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উন্নিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে আদেশ পাঠাইলেন। তখন নির্ম্মল চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া কাণে কাণে বলিল, “বেগম, তোমার দাসীপনা করিল কৈ?” এই বলিয়া নির্ম্মল উদিপুরীকে বলিল, “আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না?”

উদিপুরী বলিল, “তোমার জিব আমি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ? কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরে চিহ্ন মাত্র রাখিব না।”

তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটা মিষ্টি কথাও বলিতে জানেন না। অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদী মহলে গিয়া আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনুন।”

জেব-উন্নিসা বলিল, “সে কি মহারাণি! আপনি এত নির্দ্দয়?”

চঞ্চলকুমারী বলিল, “আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিঘ্ন করিবে না। ইহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিতেছি না।”

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিল, শেষ উদিপুরীও কিছু বিনীতভাব অবলম্বন করিল। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, “আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।”

তখন উদিপুরী বলিল, “তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।”

চঞ্চলকুমারী বলিল, “বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।”

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইল। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর জন্য তামাকু সাজিল।

তখন চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, “এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বাদশাহকে জানাইবেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তসবিরে নাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিলেন, পুনশ্চ যদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন,

তাহা হইলে আমি কেবল তসবিরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।”

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজলকান্তি হইয়া বিদায় লইল।

মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নিকাণ্ডে তৃষিতা চাতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিল। মোগল ত পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল। নির্ম্মল বলিল, “মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?”

চঞ্চল বলিল, “তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? স্ত্রীলোক হইয়া বার বার এই কথা কি বলা যায়?”

নির্ম্মল। তবে রূপনগরে, তোমার পিতাকে কেন আসিতে লেখ না?

চঞ্চল। কেন? সেই পত্রের উত্তরের পর আবার পত্র লিখিব?

নির্ম্মল। বাপের উপর রাগ অভিমান কি?

চঞ্চল। রাগ অভিমান নয়। কিন্তু একবার লিখিয়া–সে আমারি লেখা–যে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপে, আর কি লিখিতে সাহস হয়?

নির্ম্মল। সে ত বিবাহের জন্য লিখিয়াছিলে?

চঞ্চল। এবার কিসের জন্য লিখিব?

নির্ম্মল। যদি মহারাণা কোন কথা না পাড়িলেন–তবে বোধ করি, পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই ভাল,–ঔরঙ্গজেব এ দিকে আর ঘেঁষিবে না। সেই জন্য পত্র লিখিতে বলিতেছিলাম। পিত্রালয় ভিন্ন আর উপায় কি?

চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না–চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল।

চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, “আমি দিল্লীর বাদশাহের কাছে কখন অপ্রতিভ হই নাই–তোমার কাছে অপ্রতিভ হইলাম–ইহা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে বড় লজ্জার কথা। ইম্‌লি বেগমেরও কিছু লজ্জার কথা। তা, তুমি একবার ইম্‌লি বেগমের মুন্‌শীআনা দেখ। দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ কর–আমি বলিয়া যাইতেছি।”

চঞ্চল জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকে লিখিব–মাকে, না বাপকে?”

নির্ম্মল বলিল, “বাপকে।”

চঞ্চল পাঠ লিখিলে, নির্ম্মল বলিয়া যাইতে লাগিল, “এখন মোগল বাদশাহ মহারাণার হস্তে–”

“বাদশাহ” পর্য্যন্ত লিখিয়া চঞ্চলকুমারী বলিল, “মহারাণার হস্তে” লিখিব না–“রাজপুতের হস্তে” লিখিব। নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তা লেখ।” তার পর নির্ম্মলের কথন মতে চঞ্চল লিখিতে লাগিল–

“হস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইতে তাড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে আর তাঁহার আমাদিগের উপর বলপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার

সন্তানের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা? আমি আপনারই অধীন–”

পরে নির্ম্মল বলিল, “মহারাণার অধীন নই।”

চঞ্চল বলিল, “দূর হ পাপিষ্ঠা।” সে কথা লিখিল না। নির্ম্মল বলিল, “তবে লেখ, আর কাহারও অধীন নই।” অগত্য চঞ্চল তাহাই লিখিল।

এইরূপ পত্র লিখিত হইলে, নির্ম্মল বলিল, “এখন রূপনগর পাঠাইয়া দাও।” পত্র রূপনগরে প্রেরিত হইল। উত্তরে রূপনগরের রাও লিখিলেন, “আমি দুই হাজার ফৌজ লইয়া উদয়পুর যাইতেছি। ঘাট খুলিয়া রাখিতে রাণাকে বলিবে।”

এই আশ্চর্য উত্তরের অর্থ কি, তাহা চঞ্চল ও নির্ম্মল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা বিচার স্থির করিল যে, যখন ফৌজের কথা আছে, তখন রাণাকে, অবগত করা আবশ্যক। নির্ম্মলকুমারী মাণিকলালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রাণাও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে ভুলেন নাই। তিনি বিক্রম সোলাঙ্কিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম, চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা। বিক্রম সিংহ কন্যাকে শাপ দিয়াছিলেন, রাণা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আর তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহাও স্মরণ করাইলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন আপনার কিরূপ অভিপ্রায়?”

এই উত্তরে বিক্রম সিংহ লিখিলেন, “আমি দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।”

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারীর মত, সমস্যা বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, “দুই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে? আমি সতর্ক আছি।” অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অগ্নি পুনর্জ্বালিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া, ঔরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রি যাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহী মহালে গান, গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। একজন মোগল বলিল, “হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া আমরা একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।” শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, “বাঁচিয়া, আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই–তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।” একজন গায়িকা কতকগুলি সৌখীন মোগলদিগের সম্মুখে গীত করিতেছিল; গায়িতে গায়িতে তাহার তাল কাটিয়া গেল। একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিল, “বিবিজান! এ কি হইল? তাল কাটিল যে?” গায়িকা বলিল, “আপনাদের যে বীরপনা দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দুস্থানে থাকিতে সাহস হয় না। উড়িষ্যায় যাইব মনে করিয়াছি–তাই তাল কাটিতে শিখিতেছি।” কেহ বা উদিপুরীর হরণবৃত্তান্ত লইয়া দুঃখ করিতে লাগিল–কোন খয়েরখাঁ হিন্দুসৈনিক রাবণকৃত সীতাহরণের সহিত তাহার তুলনা করিল– কেহ তাহার উত্তরে বলিল, “বাদশাহ এত বানর সঙ্গে আনিয়াছিল, তবু এ সীতার উদ্ধার হইল না কেন?” কেহ বলিল, “আমরা সিপাহী–কাঠুরিয়া নহি, গাছ কাটা বিদ্যা আমাদের নাই, তাই হারিলাম।” কেহ উত্তরে বলিল, “তোমাদের ধানটাকা পর্য্যন্ত বিদ্যা, তা গাছ কাটিবে কি?” এইরূপ রঙ্গ রহস্য চলিতে লাগিল।

এ দিকে বাদশাহ শিবিরের রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিলে জেব-উন্নিসা তাঁহার নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইল। বাদশাহ জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, “তুমি যাহা করিয়াছ,

তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর নাই, বুঝিতে পারিতেছি। এজন্য তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু সাবধান! বিবাহের কথা প্রকাশ না পায়।”

তারপর উদিপুরী বেগমের সঙ্গে বাদশাহ সাক্ষাৎ করিলেন। উদিপুরী তাঁহার অপমানের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। দশটা বাড়াইয়া বলিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঔরঙ্গজেব শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইলেন।

পরদিন দরবারে বসিয়া, আমদরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, “এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচ পদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সবদার করিলাম। পরওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আকব্বর, পর্ব্বত মধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁহার উদ্ধারের জন্য দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার ন্যায় যোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অদ্যই যাত্রা কর।”

মবারক এ সকল কথায় আহ্লাদিত হইলেন না; কেন না, জানিতেন, ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও হইলেন না। অতি বিনীত ভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া দিলীর খাঁর শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব একজন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁর নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মবারক খাঁকে দুইহাজারি মন্‌সবদার করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই—নহিলে অন্য প্রকারে যেন মরে। দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তার পর ঔরঙ্গজেব আমদরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, “আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভুঁইঞা রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুঙারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে, আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গোরু দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।”

এই সকল হুকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইসুরীর পথ দিয়া মাড়বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন শুনিয়া রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন? ঔরঙ্গজেব বলিলেন, “ভুইঞার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।” শুনিয়া, রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, “আমি এখনও জীবিত আছি।” রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের “রাও সাহেবকে” এক পর্‌ওয়ানা দিলেন, তাহাতে লিখিলেন, “তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে—নহিলে রূপনগরের গড়ের চিহ্ন রাখিব না।” ঔরঙ্গজেবের ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সম্মত হইতে পারে। পরওয়ানা পাইয়া বিক্রমসিংহ উত্তর লিখিল, “আমি শীঘ্র দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া আপনার হুজুরে হাজির হইব।”

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন, “সেনা কেন?” মনকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মবারকের দাহনারম্ভ

সৌন্দর্য্যের কি মহিমা! মবারক জেব-উন্নিসাকে দেখিয়া আবার সব ভুলিয়া গেল। গর্ব্বিতা, স্নেহাভাবদর্পে প্রফুল্লা জেব-উন্নিসাকে দেখিলে আর তেমন হইত কি না, বলা যায় না, কিন্তু সেই জেব-উন্নিসা এখন বিনীতা, দর্পশূন্য, স্নেহশালিনী, অশ্রুময়ী। মবারকের পূর্ব্বানুরাগ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। দরিয়া, দরিয়ায় ভাসিয়া গেল। মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ আর নাই।

সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভুবন তুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় দুঃখের সহিত বলিল, "তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই সুখ দশ দিন ভোগ করিতে পারিলাম না।"

জেব-উন্নিসা। কেন? কে বাধা দিবে? বাদশাহ?

মবারক। সে সন্দেহও আছে। কিন্তু বাদশাহের কথা এখন বলিতেছি না। আমি কাল যুদ্ধে যাইব। যুদ্ধে মরণ জীবন দুই আছে। কিন্তু আমার পক্ষে মরণ নিশ্চয়। আমি রাজপুতদিগের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত জানি যে, পার্ব্বত্য যুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারিব না। আমি একবার হারিয়া আসিয়াছি, আর একবার হারিয়া আসিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে মরিতে হইবে।

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, "ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।"

উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, "মরিব, না মরিব না?" অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল–তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পট-নির্ম্মিতা মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া–দূরে পর্ব্বতের চূড়ার উপর চূড়া–তার উপর চূড়া–বড় অন্ধকার। দুই জনে বড় অন্ধকারই দেখিল।

সহসা জেব-উন্নিসা বলিল, "এই অন্ধকারে, শিবিরের প্রাচীরের তলায়, কে লুকাইল? তোমার জন্য আমার মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত।

"দেখিয়া আসি," বলিয়া মবারক ছুটিয়া দুর্গপ্রাকারতলে গেলেন। দেখিলেন, একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধৃত করিলেন। হাত ধরিয়া তুলিলেন। যে লুকাইয়াছিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল। অন্ধকারে মবারক কিছু ঠাওর পাইলেন না। তাহাকে টানিয়া দুর্গমধ্যে দীপালোকের নিকট আনিলেন। দেখিলেন যে, একটা স্ত্রীলোক। সে মুখে কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল–মুখ খুলিল না। মবারক তাহাকে একজন প্রতিহারীর জিম্মায় রাখিয়া, স্বয়ং জেব-উন্নিসার নিকট গিয়া সবিস্তার নিবেদন করিলেন। জেব-উন্নিসা কৌতূহলবশতঃ তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিতে অনুমতি দিলেন। মবারক তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিল, "তুমি কে? কেন লুকাইয়াছিলে? মুখের কাপড় খোল।"

সে স্ত্রীলোক তখন মুখের কাপড় খুলিল। দুই জনে সবিস্ময়ে দেখিল–দরিয়া বিবি!

বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্রপতন দেখিলে, যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিনি জনের কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, "ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "তবে আমাকেও।"

দরিয়া বলিল,"তোমরা কে?"

মবারক তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।"

তখন মবারক অতি দীনভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থানবিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, বিক্রমসিংহ রূপনগর হইতে দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ, রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আসিল। সে রাজসিংহেক প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কি মহারাণার দর্শন মানসে সসৈন্যে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে। আমি সসৈন্যে যাইতেছি।"

বিক্রম সোলাঙ্কি একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রমসিংহ, রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান,–এ জন্য এ নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর না গ্রহন করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে এ নজর, মোগল বাদশাহেরেই প্রাপ্য।"

বিক্রমসিংহ বলিলেন, "মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে। আমার পত্রের শেষ ভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি। এক আমার এই দুই সহস্র অশ্বারোহী; দ্বিতীয় আমার নিজের এই তরবারি;–আজিও এ বাহুতে কিছু বল আছে; আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর পতন করিয়াও সে কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে জানাইলেন। বলিলেন, "আজ আপনি সোলাঙ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট মোগল, আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খাঁ সৈন্য লইয়া শাহজাদা আকব্বরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে– সে গিয়া আকব্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে কুমার জয়সিংহের বিপদ্ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব–মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছে–সে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিকটে, আমি নিজে এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না, অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপনারা তিন জনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈন্যে সংহার করুন।"

বিক্রমসিংহ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থে বিদায় হইলেন। চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি, এবং মাণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। যে পথে দিলীর খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জন লুক্কায়িত রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদূরেই রহিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, কাজেই তিনি উচ্চ সানুদেশে থাকিতে পারিলেন না। তিনি পর্ব্বতবাসী হইলেও তাঁহাকে অশ্ব রাখিতে হইত; তাহার কারণ, তদ্ব্যতীত নিম্নভূমিনিবাসী শত্রু ও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পরিতেন না। আর এমন সকল ক্ষুদ্র রাজগণ, রাত্রিকালে সুযোগ পাইলে, নিজে নিজেও এক আধটা ডাকাতি–অর্থাৎ এক রাত্রিতে দশ পাঁচখানা গ্রাম লুণ্ঠন না করিতেন, এমন নহে। পর্ব্বতের উপর তাঁহার সৈনিকেরা অশ্ব ছাড়িয়া পদাতিকের কাজ করিত। এক্ষণে মোগলের পশ্চাদনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া, বিক্রমসিংহ অশ্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুবিধা হইল। অতএব তিনি পর্ব্বতে না উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির অন্বেষণ করিলেন। মনোমত সেরূপ কিছু ভূমি পাইলেন। তাহার সম্মুখে কিছু বনজঙ্গল আছে। জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহীগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহর পদাতিকগণ লইয়া লুক্কায়িত হইল। সর্ব্বশেষে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন।

দিলীর খাঁ আকব্বরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, একটু সতর্কভাবে আসিতেছিল–অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহী পাঠাইয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে, রাজপুত কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। অতএব বিক্রম সোলাঙ্কির অশ্বারোহিগণের সন্ধান, তাঁহাকে সহজে মিলিল। তিনি তখন কতকগুলি সৈন্য, অশ্বারোহীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি অন্যান্য বিষয়ে বড় স্থূলবুদ্ধি, কিন্তু যুদ্ধকালে অতিশয় ধূর্ত্ত এবং রণপণ্ডিত–অনেক সময়ে ধূর্ত্ততাই রণপাণ্ডিত্য–তিনি মোগল সেনার সঙ্গে অতি সামান্য যুদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন–দিলীর খাঁর মুণ্ডপাত করিবার জন্য।

দিলীর মাণিকলালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন, মাণিকলাল যে পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনিও জানিতে পারিলেন না–মাণিকলালও কোন সাড়াশব্দ করিল না। সোলাঙ্কিকে তাড়াইয়া দিলীর বিবেচনা করিয়াছিলেন, সব রাজপুতই হঠিয়াছে–অতএব আর পূর্ব্ববৎ অবধানের সহিত চলিতেছিলেন না। মাণিকলাল বুঝিল, এ উপযুক্ত সময় নহে–সেও স্থির রহিল।

পরে, যথায় গোপীনাথ রাঠোর লুক্কায়িত, তাহারই নিকট দিলীর উপস্থিত। সেখানে পর্ব্বতমধ্যস্থ পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সেইখানে সেনার মুখ উপস্থিত হইলে, গোপীনাথ রাঠোর লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া, বাঘ যেমন পথিকের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসে, সেইরূপ সসৈন্যে বসিলেন।

দিলীর, মবারককে আজ্ঞা করিলেন, “সম্মুখবর্ত্তী সেনা লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দাও।” মবারক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোপীনাথ রাঠোরকে তাড়াইবার তার সাধ্য কি? সঙ্কীর্ণ পথে অল্প মোগলই দাঁড়াইতে পারিল। যেমন গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা বাহির হইবার সময়ে, বালকে একটি একটি করিয়া টিপিয়া মারে, তেমনই রাজপুতেরা মোগলদিগকে সঙ্কীর্ণ পথে টিপিয়া মারিতে লাগিল। এ দিকে দিলীর, সম্মুখে পথ না পাইয়া, সেনা লইয়া নিশ্চল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাণিকলাল বুঝিল, এই উপযুক্ত সময়। সে সসৈন্যে পর্ব্বতাবতরণ করিয়া বজ্রের ন্যায় দিলীরের উপর পড়িল। দিলীর খাঁর সেনা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে

লাগিল। কিন্তু এই সময়ে বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া হঠাৎ দিলীরের সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন দিকে আক্রান্ত হইয়া মোগল সেনা আর এক দণ্ড তিষ্ঠিল না। যে পারিল, সে পলাইয়া বাঁচিল। অধিকাংশই পলাইবার পথ পাইল না–কৃষকের অস্ত্রের নিকট ধান্যের ন্যায় ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল।

কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখে, কয়জন মোগল যোদ্ধা কিছুতেই হঠিল না–মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা মোগলসেনার সার–বাছা বাছা লোক। মবারক তাহাদের নেতা। কিন্তু তাহারাও আর টিকে না। পলকে পলকে এক একজন বহুসংখ্যক রাজপুতের আক্রমণে নিপাত যাইতেছিল। শেষ দুই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, “ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।”

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল, “তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে তোমাদের কেহ কিছু বলিবে না।”

একজন মোগল বলিল, “আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব না।” সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাণিকলাল মবারককে ডাকিয়া বলিলেন, “খাঁ সাহেব! আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবে?”

মবারক বলিল, “মরিব।”

মাণিক। কেন মরিবে?

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই?

মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেন?

মবা। মরিবার জন্য।

এই সময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিকলাল দেখিলেন, মবারক জীবনশূন্য। মাথায় গুলি বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের সানুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দুকের মুখনিঃসৃত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া!

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। সে হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল। সেই অবধি দরিয়া বিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিল, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল–

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : পূর্ণাহুতি–ইষ্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন, “একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি?”

রাজসিংহ বলিলেন, “তবে উদয়পুরে চলুন।”

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপন্যাসলেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া, বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখো হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এ দিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র, কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকার প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমনকি, মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন। অনেক স্থান অধিকার করিয়া সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণহৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপে ইনি কাজিদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল সাহ, কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল পদে পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষে ঔরঙ্গজেব সত্য সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে–হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই–হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক–সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারী তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এ সকল কল্পনা।

ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন–ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্রজাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবজী ও ইংলণ্ডের তৎকালিন নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্ত্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে, দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন–এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।